Banglapdf.net

মেঘের কোলে রোদ

কাসেম বিন আবুবাকার

AKAS SUVOM

মেঘের কোলে রোদ

কাসেম বিন আবুবাকার

মেঘের কোলে রোদ

কাসেম বিন আবুবাকার

বিশ্ব সাহিত্য ভবন
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল ❑ আগস্ট ২০০১

প্রকাশক ❑ তোফাজ্জল হোসেন বিশ্ব সাহিত্য ভবন ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
অক্ষরবিন্যাস ❑ কমপিউটার ল্যান্ড ৩৮/২খ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ ❑ সালমানী মুদ্রণ সংস্থা ৩০/৫ নয়াবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ ❑ ধ্রুব এষ   স্বত্ব ❑ লেখক

মূল্য ❑ ৭০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

স্বনামধন্য সাংবাদিক ও লেখক

আনিসুল হক

স্নেহবরেষু

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শুভম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

১. "তোমরা উত্তম সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায়কে প্রকাশ করা হইয়াছে মানবমণ্ডলীর জন্য। তোমরা নেক কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখ এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখ।"—আল কুরআন, সূরা—আল ইমরান, ১০৯নং আয়াতের প্রথম দিকের অংশ, পারা—৪

২. "যার বাড়িতে একটি লাইব্রেরি আছে মানসিক দিক দিয়ে সে অনেক বড়।"

—দার্শনিক ইবসেন

৩. "রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে; কিন্তু বই অনন্ত যৌবনা—যদি তেমন বই হয়।" —ওমর খৈয়াম

মেঘের কোলে রোদ

কাসেম বিন আবুবাকার

স্ক্যানের জন্য বইটি দিয়েছেন

গোলাম মাওলা আকাশ

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

এই বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট

(fb.com/groups/Banglapdf.net)

বইপোকাদের আড্ডাখানা

(fb.com/groups/boiipoka)

এর সৌজন্যে নির্মিত

WEBSITE:

WWW.BANGLAPDF.NET

লেখকের অন্যান্য বই

মেঘলা আকাশ
ফুলের কাঁটা
সে কোন বনের হরিণ
ফুটন্ত গোলাপ
বিদেশী মেম
ক্রন্দসী প্রিয়া
কি পেলাম
জ্যোৎস্না রাতে কালো মেঘ
প্রেমের পরশ
বিলম্বিত বাসর
স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
অনন্ত প্রেম
শেষ উপহার
কলঙ্কের ফুল
শহরের মেয়ে
তুমি সুন্দর
বিয়ে বিভ্রাট
কালো মেয়ে
পলাতকা
বিয়ের খোঁপা (ছোট গল্প)
বিকেলে ভোরের ফুল
কামিনী কাঞ্চন
প্রেম ও স্বপ্ন
তোমার প্রত্যাশায়
হৃদয়ে আঁকা ছবি
ভাঙ্গাগড়া
কে ডাকে তোমায়
স্বর্ণ তুমি
বধূয়া
বহুরূপিনী
হৃদয় যমুনা
অচেনা পথিক
বড় আপা
আমি তোমা:
প্রেমের ফসল (ছোট গল্প)
শ্রাবণী
ভালবাসার নিমন্ত্রণ
আজরাইল (আঃ) এর কান্না (কিশোর গল্প)
প্রতিবেশিনী
পল্লীবালা
আধুনিকা
ধনীর দুলালী
হঠাৎ দেখা
কেউ ভোলে কেউ ভোলে না
প্রেম যেন এক সোনার হরিণ
যেতে নাহি দেব
শরীফা
শ্রেয়সী
একটি ভ্রমর পাঁচটি ফুল
প্রেম বেহেস্তের ফল
বিদায় বেলায়
পাহাড়ী ললনা
বাসর রাত
বালিকার অভিমান
অবাঞ্ছিত উইল
চেনা মেয়ে
সংসার
কাঙ্ক্ষিত জীবন
অলৌকিক প্রেম
মানুষ অমানুষ
প্রতীক্ষা
অবশেষে মিলন
অসম প্রেম
ভালবাসি তোমাকেই
প্রেম
পথে পরিচয়
ধূমায়িত পথ
অমর প্রেম
আমিও মানুষ
তুমিও মানুষ
রাগ অনুরাগ
সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে

কার্পাসডাঙ্গা হেলথ কমপ্লেক্স-এর হাবিব ডাক্তার কুতুবপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় রুগী দেখতে গিয়েছিল। ফেরার পথে পিছনের চাকায় হাওয়া নেই দেখে সাইকেল হাতে ধরে হেঁটে আসার সময় ভাবল, হয়তো রাস্তার পাশে বাবলা গাছের কাঁটা অথবা অন্য কিছু টায়ার ভেদ করে টিউবে ঢুকে চোরা লিক হয়েছে।

খাঁপাড়ার নাদের আলি দুধেল গাভীর জন্য ক্ষেতের আল থেকে কাঁচা ঘাস কেটে রাস্তায় জমা করছিল। দূর থেকে হাবিব ডাক্তারকে সাইকেল ধরে হেঁটে আসতে দেখে তার দিকে তাকিয়ে ভাবল, উনি ডাক্তার না হয়ে মাওলানা বা পীর সাহেব হলেই ভালো হত। পাজামা-পাঞ্জাবী, টুপি-দাড়িওয়ালাও যে ডাক্তার হয়, ইনাকে না দেখলে বিশ্বাসই করত না। রুগীকে ওষুধও দেন, আবার পানিপড়াও দেন, ঝাড়ফুকও করেন। রুগী দেখতে গেলে দেখার আগেই রুগী অর্ধেক ভালো হয়ে যায়। গরিবদের কাছ থেকে ফি নেন না, বরং রুগীর পথ্য ও ওষুধ কেনার টাকা দেন। তাই গ্রামের অধিকাংশ মানুষের মতো নাদের আলির বিশ্বাস, ইনি নিশ্চয় কামেল লোক।

ততক্ষণে হাবিব ডাক্তার কাছে এসে যেতে বলল, স্লামালেকুম ডাক্তার সাহেব।

ওয়া আ'লায়কুমুস সালাম বলে হাবিব ডাক্তার বলল, নাদের আলি, তোমার কিন্তু সালাম দেয়া ঠিক হয় নি।

নাদের আলি অবাক হয়ে বলল, কেন? আপনিই তো সেদিন বললেন, এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। দেখা হলে একে অপরকে সালাম দেবে। আরো বললেন, যে আগে দেবে তার সওয়াব বেশি।

হ্যাঁ, তা বলেছি।

তা হলে আমার সালাম দেয়া ঠিক হয় নি বলছেন কেন?

হাবিব ডাক্তার জানে নাদের আলি অল্প শিক্ষিত সহজ-সরল ছেলে। তাই মৃদু হেসে বলল, সালাম দেয়া ঠিক হলেও তোমার উচ্চারণ ঠিক হয় নি।

কিন্তু আজকাল শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাইতো এই কথা বলে সালাম দেয়। আমি তাদেরটা শুনে শিখেছি।

তাদেরটাও ঠিক হয় নি। আমি শুদ্ধ উচ্চারণ করছি শিখে নাও, "আস সালামু আ'লায়কুম।"

নাদের আলির স্মরণশক্তি ভালো। মনে মনে কয়েকবার উচ্চারণ করে বলল, "আস সালামু আ'লায়কুম।"

হাবিব ডাক্তার আবার মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে।

নাদের আলি হাবিব ডাক্তারকে কদমবুসি করে বলল, আপনি না শেখালে চিরকাল ভুল সালাম দিতাম।

তুমি কিন্তু আবার একটা ভুল করে ফেললে।

কি ভুল করলাম বলুন, আমি শুধরে নেব।

মা-বাবা ও মুরুব্বীদের অথবা আল্লাহওয়ালা লোকদের ছাড়া যাকে তাকে কদমবুসি করতে নেই। আমি একজন সামান্য ডাক্তার, আমাকে করা ঠিক হয় নি।

গ্রামের লোকজন আপনাকে খুব কামেল ও আল্লাহওয়ালা বলে মনে করে। আমিও মনে করি। আপনার মতো ভালো মানুষ জীবনে দেখি নি। আপনাকে কদমবুসি করব নাতো কাকে করব? ওকথা বাদ দেন, সাইকেল থাকতে হেঁটে আসছেন কেন বলুন। তারপর পিছনের চাকায় হাওয়া নেই দেখে আবার বলল, মনে হয় যখন রুগী দেখছিলেন তখন কোনো দুষ্টু ছেলে হাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।

আপনার মনে না হলেও আমি কসম কেটে বলতে পারি কোনো ছেলে দুষ্টুমী করে হাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

হঠাৎ তোমার এরকম কথা মনে হল কেন?

নাদের আলি মৃদু হেসে বলল, ছোটবেলায় চান্স পেলেই কত লোকের সাইকেলের হাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। একবার ধরা পড়ে বকুনী ও চড় হজম করতে হয়েছে। তারপর জিজ্ঞেস করল, আমার ও আতিকার ব্যাপারটা নিয়ে এগোতে পেরেছেন?

এ ব্যাপারে পরে কথা বলব, এখন সবর করে থাক। অনেক দেরি হয়ে গেল। বাজারে গিয়ে সাইকেলের লিক সারাতে হবে।

ঠিক আছে যান, স্লামালেকুম, থুক্কু, আস সালামু আ'লায়কুম।

হাবিব ডাক্তার মৃদু হেসে সালামের উত্তর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

নাদের আলি ঘাস কাটতে কাটতে চিন্তা করল, ডাক্তার সাহেবের বয়স কত হতে পারে? দাড়ির জন্য চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মনে হয়। আসল বয়সটা কত একদিন জিজ্ঞেস করতে হবে।

বিশ্বাসপাড়ার ভিতর থেকে রাস্তা। রাস্তার ধারে মুশতাক বিশ্বাসের বাড়ির সদর। সদরের কাছে এসে রাস্তায় আতিকাকে দেখে হাবিব ডাক্তার সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন?

সালামের উত্তর দিয়ে আতিকা বলল, কতবার বলেছি আমাকে তুমি করে বলবেন, তবু আপনি করে বলেন কেন?

ওকথা থাক, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন বলুন। কারো অসুখ-বিসুখ করে নি তো?

না, কারো কিছু হয় নি। আপনি আমার কথার উত্তর দিলেন না যে?

দেখুন, আমি হলাম একজন সামান্য ডাক্তার। আর আপনি হলেন এই গ্রামের সব থেকে ধনী মুশতাক বিশ্বাসের মেয়ে। তার উপর এস.এস.সি. পাশ। আপনি করে বলাইতো উচিত। তা ছাড়া একজন শিক্ষিত মানুষকে তুমি করে বললে অসম্মান করা হয়।

তা হয়, কিন্তু আমি তো আপনার থেকে বয়সে অনেক ছোট? আপনিই বলুন না, ছোটকে কী কেউ আপনি করে বলে?

তা বলে না, তবে আপনাকে আমি তুমি করে বলতে পারব না।

কেন?

কেনর উত্তরও দিতে পারব না। এবার আসি বলে হাঁটতে শুরু করল।

আতিকা দ্রুত এগিয়ে এসে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে বলল, কেন পারবেন না, না বললে আমিও যেতে দেব না।

হাত সরান, কেউ দেখে ফেললে কী ভাববে?

সে যাই ভাবুক, তাতে আমার কোনো যায় আসে না। আগেও বলেছি এখনও বলছি, আমি আপনার ছোট বোনের মতো। তবু তুমি করে বলতে পারছেন না কেন বলতে হবে।

আপনি তো খুব জিদ্দী মেয়ে? নাদের আলিকে দেখলাম, ক্ষেতের আলে ঘাস কাটছে। দেখে ফেললে কি মনে করবে?

আতিকা অনেক দিন হল নাদের আলিকে দেখে নি। দোতলার রুম থেকে মাঠ দেখা যায়। অনেক সময় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে। রাস্তার দিকেও নজর রাখে। কখন সখন নাদের আলি মাঠে কাজ করতে এলে অথবা রাস্তা দিয়ে কোথাও গেলে তাকে দেখে। আজও অনেক দূরে তার মতো কাউকে ঘাস কাটতে দেখে সেদিকে তাকিয়েছিল। হাবিব ডাক্তারকে তার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। হাবিব ডাক্তার সাইকেল ধরে হেঁটে আসছে দেখে নেমে এসে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল ঐ ছেলেটা নাদের আলি কিনা জানার জন্য। কিন্তু লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে পারে নি। হাবিব ডাক্তার দেখে ফেলার কথা বলতে

সাইকেলের হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়ে মুখ নিচু করে বলল, দেখলেও কিছু মনে করবে না। সে আপনাকে পীরের মতো মানে। তারপর বলল, আপনি এত লোকের উপকার করে বেড়াচ্ছেন, আমার আর নাদের আলি ভাইয়ের কোনো উপকার করতে পারলেন না।

হাবিব ডাক্তার একটু গম্ভীর স্বরে বলল, এসব কাজে তাড়াহুড়ো করতে নেই। কথায় আছে না, "ধৈর্যই সাফল্যের চাবি?" নাদের আলির বাপ-দাদাদের সঙ্গে আপনার বাপ-দাদাদের অনেকদিন আগে থেকে শত্রুতা। তা ছাড়া নাদের আলি এইট পাশ। তার উপর গত বছরের বন্যায় তার মা-বাবা মারা গেছেন। এক বিধবা ফুফু ছাড়া তার কেউ নেই। ঘরবাড়ি বন্যায় ভেসে গেছে। নাদের আলি কোনো রকমে একটা বেড়ার ঘর করে ফুফুকে নিয়ে থাকে। আপনার আব্বা বা ভাই কিছুতেই আপনাদের ভালবাসা মেনে নেবেন না। আমি আপনাদের ব্যাপারে মাথা গলাতাম না। শুধু দুই বংশের শত্রুতা দূর করে মিত্রতা করার জন্য মাথা গলিয়েছি। কারণ এটা করা প্রত্যেক মুমীন মুসলমানের কর্তব্য।

আতিকা বলল, শুনেছি আপনি কামেল মানুষ। অনেক রুগীকে পানিপড়া দিয়ে ও ঝাড়ফুক করে ভালো করেন। আমাকে পানিপড়া দিয়ে যান। আমি আব্বাকে ও ভাইয়াকে খাওয়াব। তা হলে তারা আমাদের ভালবাসা মেনে নেবে।

হাবিব ডাক্তার মৃদু হেসে বলল, এসব আজেবাজে কথায় কান দেবেন না। রুগীকে ওষুধ দিই। সেই সাথে আল্লাহর কালাম পড়ে গায়ে ফুক দিই। আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করে সবর করুন। নাদের আলিকেও একটু আগে সবর করতে বলে এসেছি। বাকি আল্লাহর মর্জি। তাঁর মর্জি থাকলে কিছু একটা করতে পারব বলে ভরসা রাখি। এখন আসি, অনেক দেরি হয়ে গেল বলে সালাম বিনিময় করে হাঁটতে শুরু করল।

আতিকা তার দিকে তাকিয়ে নাদের আলির মতো চিন্তা করল, ডাক্তারের বয়স কত হতে পারে? মাস ছয়েক আগে আব্বার অসুখের সময় ভাইয়া যেদিন তাকে নিয়ে এসেছিল, সেদিন পোশাক দেখে খুব অবাক হয়ে ভেবেছিল, হুজুররাও তা হলে ডাক্তার হয়। তারপর আরো কয়েকদিন আব্বাকে দেখতে এলে এবং আব্বা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলে তার প্রতি আতিকার ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মায়। পরে ক্রমশ তার সুনাম ছড়িয়ে পড়লে সেই ভক্তি-শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়। ভাইয়ার গলা পেয়ে আতিকার চিন্তা ছিন্ন হয়ে গেল।

স্কুল ছুটির পর পারভেজ বাড়ি ফিরছিল। দূর থেকে বোনকে হাবিব ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। কাছে এসে বলল, দেখলাম হাবিব

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিলি। কারো কিছু হয়ে থাকলে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারতিস?

আতিকা বলল, না ভাইয়া, কারো কিছু হয় নি। এমনিই একটু আলাপ করছিলাম।

পারভেজ ভাবল, ওর নিজের কিছু অসুবিধের কথা হয়তো ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করছিল। বলল, চল, ঘরে চল।

যেতে যেতে আতিকা বলল, হাবিব ডাক্তার লোকটা কেমন বল তো?

পারভেজ হেসে উঠে বলল, ওঁকে তুই লোক বলছিস কেন? এখনও তো বিয়েই করেন নি। দাড়ি রেখেছেন বলে বয়স একটু বেশি দেখায়।

আতিকা অবাক হয়ে বলল, তাই না কী? আমি তো মনে করেছিলাম উনি তিন চারটে ছেলেমেয়ের বাপ।

পারভেজ আবার হেসে উঠে বলল, তোর আর দোষ দেব কি, গ্রামের অনেকেই ডাক্তারকে তাই মনে করে। আমিও আগে তাই মনে করতাম। একদিন হেডমাস্টারের কাছে তার সবকিছু জেনে খুব অবাক হয়েছিলাম। অবশ্য আমার সঙ্গে এখন ডাক্তারের ভালো সম্পর্ক।

হেডমাস্টার ওঁর সবকিছু জানলেন কি করে?

ততক্ষণে বাড়ির ভিতরে চলে এসেছে। পারভেজ বলল, এখন যা, পরে শুনিস। আসরের আজান হয়ে গেছে, নামায পড়ব।

দুই

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে কুতুবপুর একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কাঁটাবাগানপাড়া, বিশ্বাসপাড়া, খাঁপাড়া, দরগাতলা পাড়া, সূতাপাড়া, বইরাপাড়া, বাহাদুর পাড়া, মাঝপাড়া, পশ্চিমপাড়া, ভিটেপাড়া ও কামড়িপাড়া নামে এগারটা পাড়া নিয়ে এই গ্রাম। বিশ্বাসপাড়ায় কুতুবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মুনসীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বইরাপাড়ায় হাফেজিয়া মাদ্রাসা আছে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ গরিব ও কৃষিজীবী। ইদানিং নানারকম ব্যবসা-বাণিজ্য করে অনেকের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তবে বিশ্বাসপাড়ার মানুষজনের অবস্থা আগের থেকে ভালো। কারো কারো একশ থেকে তিন চারশ বিঘে জমি-জায়গা আছে। মুশতাক বিশ্বাসের অবস্থা সবার থেকে ভালো। লেখাপড়া তেমন না জানলেও আর্থিক অবস্থার কারণে তিনি গ্রামের মাতব্বর। তার চার ছেলে ও দুই মেয়ের

মধ্যে সেজ ছেলে পারভেজ ও ছোট মেয়ে আতিকা ছাড়া সবাই অল্প বয়সে মারা গেছে। পারভেজ বি.এ. পাশ করে গ্রামের মাধ্যমিক স্কুলে মাস্টারি করছে। তার বিয়ে হয়েছে। ছোট দু'টো ছেলে মেয়েও হয়েছে। আতিকা তিন বছর আগে এস.এস.সি. পাশ করে পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছে। বিশ্বাসরা নিজ গোষ্ঠী ছাড়া অন্য গোষ্ঠীতে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয় না। এই নিয়ম পূর্ব পুরুষদের আমল থেকে চলে আসছে। তারা অন্য গোষ্ঠীকে ছোট জাত মনে করে। নিজ গ্রামের গোষ্ঠীদের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় মুশতাক বিশ্বাস মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য অন্যান্য গ্রামে পাত্রের সন্ধানে ঘটক লাগিয়েছেন।

আতিকা অনিন্দ্য সুন্দরী। ঠিক যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম। স্কুলে পড়ার সময় খাঁপাড়ার নাদের আলিকে তার খুব ভালো লাগত। তাই নাদের আলি পড়াশোনা ছেড়ে দিলেও তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। আজ পাঁচ ছয় বছর পরেও কেউ কাউকে ভুলতে পারে নি। বরং তাদের মনের টান আরো বেড়েছে।

খাঁপাড়ার মধ্যবিত্ত আব্দুর রশিদের পাঁচ মেয়ের পর এক ছেলে। সেই ছেলে নাদের আলি। আব্দুর রশিদ পাঁচ মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে পৈত্রিক সম্পত্তি যা ছিল, সবটা বিক্রি করেছেন। এখন বাস্তুভিটে ও তৎসংলগ্ন মাঝারি সাইজের একটা পুকুর ছাড়া আর কিছু নেই। তাই নাদের আলি ক্লাস এইটে ভালো রেজাল্ট করে নাইনে উঠলেও আর্থিক কারণে তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। সেই থেকে বাবার সঙ্গে লোকজনের গৃহস্থালী ও চাষ-বাসের কাজ করে। এখন সে বিশ বাইশ বছরের যুবক। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা, বলিষ্ঠ শরীর, গায়ের রং ফরসা। খুব পরিশ্রমী ছেলে।

আতিকা ও নাদের আলি তাদের দুই বংশের শত্রুতা ও আর্থিক ব্যবধান জানা সত্ত্বেও দিনের পর দিন গভীর ভালবাসায় জড়িয়ে পড়েছে। আগে স্কুলে যাতায়াতের পথে একে অপরের সঙ্গে দেখা করত। এস.এস.সি. পাশ করার পর আতিকা তাদের বাগান বাড়িতে নাদের আলিকে আসতে বলত। সেখানে তারা গোপন অভিসার করত। ব্যাপারটা অনেক দিন গোপন ছিল। একদিন মুশতাক বিশ্বাসের চাকর করিম জানতে পেরে আতিকার মা শাফিয়া বানুকে জানায়। তিনি কথাটা কাউকে জানাতে করিমকে নিষেধ করে দেন। তারপর একসময় মেয়েকে কথাটা জানিয়ে বললেন, "তোর আব্বা জানলে তোকে দু'খান করে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেবে। আর নাদের আলিকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেবে। তুই তাকে আসতে নিষেধ করে দিবি।"

আতিকা মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, নাদের আলি ভাইকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না। আমরা একে অপরকে অনেক বছর ধরে ভালবাসি। ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

মেয়ের কথা শুনে শাফিয়া বানু রাগ সামলাতে পারলেন না। যা জীবনে করেন নি, তাই করে বসলেন। ঠাস করে তার গালে একটা চড় মেরে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, ভালবাসার কথা বলতে তোর লজ্জা করল না? আবার যদি ঐকথা মুখে উচ্চারণ করিস, তবে তোর একদিন কি আমার একদিন।

আতিকা ভাবতেই পারে নি মা মারবে। কারণ আজ পর্যন্ত মা তাকে মারা তো দূরের কথা, কখনও রাগারাগিও করে নি। ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, ঠিক আছে, মারলে যখন আরো মারো, মেরে মেরে আমাকে মেরেই ফেল। তবু বলব নাদের আলি ভাইকে আমি প্রাণের থেকে বেশি ভালবাসি। তাকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে বিয়ে করব না। তোমরা যদি জোর করে অন্য কোথাও বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা কর, তাহলে বিয়ের দিনে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করব।

রাগের মাথায় মেয়েকে মেরে শাফিয়া বানু অনুতপ্ত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মেয়ের কথা শুনে চমকে উঠে আতঙ্কিত স্বরে বললেন, ছিঃ মা, অমন কথা মুখে আনতে নেই। একটু বোঝার চেষ্টা কর, নাদের আলির পূর্ব পুরুষদের সময় থেকে আমাদের শত্রুতা। তোর আব্বা ও ভাইয়া কিছুতেই তাকে জামাই করতে রাজি হবে না। তারা তোকে ঢাকায় বড় লোকের শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার জন্য লোক লাগিয়েছে। নাদের আলি গরিব অল্প শিক্ষিত ছেলে। তার কি আছে? একটা ভালো ঘর-বাড়ি পর্যন্ত নেই। তা ছাড়া তুই তো জানিস, বিশ্বাস বাড়ির ছেলেমেয়ের বিয়ে অন্য কোনো গোষ্ঠীতে হয় না। শিক্ষিত মেয়ে হয়ে বংশ মর্যাদার কথা চিন্তা করবি না? এরকম পাগলামী করিস নি মা। ওকে মন থেকে মুছে ফেল।

আতিকা কান্না থামিয়ে বলল, এসব কথা আমি যেমন চিন্তা করেছি, নাদের আলি ভাইও তেমনি করেছে। তবু আমরা কেউ কাউকে ভুলতে পারছি না। মা হয়ে তুমি যদি কিছু একটা না কর, তা হলে গলায় ফাঁস দেয়া ছাড়া আমার আর কোনো পথ খোলা নেই।

শাফিয়া বানু ভয়ার্তকণ্ঠে বললেন, বারবার ঐ কথা বলিস নি মা। জানিস না, যারা নিজের জান নিজে দেয়, তারা পরকালে জাহান্নামী হয়? এরকম কথা যারা চিন্তা করে, শয়তান তাদেরকে সুযোগ পেলেই তা করার জন্য ওয়াসওয়াসা দেয়। কারণ সে মানুষকে জাহান্নামী করতে চায়। আর কখনও ওরকম কথা চিন্তা করবি না। যা বলছি শোন, "নাদের আলিকে তোর সঙ্গে দেখা করতে আসতে নিষেধ করে দিয়ে বলবি, আব্বা জানতে পারলে তোমার খুব বিপদ হবে। আম্মা আমাদের ব্যাপারটা জেনে গেছে। সে আব্বাকে রাজি করাবার চেষ্টা করবে।"

মায়ের কথা বিশ্বাস করে আতিকা নাদের আলিকে কথাটা জানালেও তাদের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে নি। মাঝপাড়ার কুলসুম, তার বান্ধবী। সে তাদের

দু'জনের সম্পর্কের কথা জানত। কুলসুমদের বাড়িতে যাওয়ার নাম করে আতিকা নাদের আলির সঙ্গে দেখা করত। কুলসুমই তাদের দেখা করার সুযোগ করে দিত। বছর খানেকের মধ্যে বইরাপাড়ায় কুলসুমের বিয়ে হয়ে যেতে তাদের দেখা সাক্ষাতের সুযোগ আরো ভালো হল। বিশ্বাসপাড়া থেকে বইরাপাড়া যেতে হলে খাঁপাড়ার উপর দিয়ে যেতে হয়।

তারপরের বছর বন্যা হয়ে আশপাশের কয়েকটা ইউনিয়নের ঘর-বাড়ি, গরু-ছাগল ও অন্যান্য সবকিছু ভেসে যায়। বহু মানুষ ও গবাদি পশু মারা যায়। যারা বেঁচে ছিল তারা বহুদূরে সাঁতরে সাঁতরে আমবাগান, হার্টিকালচার, নাটোদা হাইস্কুল ও সরকারী শিবিরে আশ্রয় নেয়। যাদের পাকা বাড়ি ছিল তারা অনেককে আশ্রয় দেয়। সেই সময় কুলসুমের বাচ্চা হয়েছিল। সেও বন্যায় ভেসে গিয়ে মারা যায়। আর নাদের আলির মা বাবাও মারা যায়। শুধু নাদের আলি কোনো রকমে বেঁচে গেছে।

বন্যার পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর বেঁচে যাওয়া মানুষ যখন গ্রামে ফিরে আবার বাড়ি-ঘর তৈরী করে ক্ষেতে ফসল ফলাতে শুরু করল তখন আতিকা লোকের দ্বারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, নাদের আলি বেঁচে থাকলেও তার মা বাবা মারা গেছে। সে একটা বেড়ার ঘর তুলে তার এক বিধবা ফুফুকে নিয়ে থাকে। একদিন তার সেঙ্গে দেখা করে বলল, এই দু'আড়াই মাস তোমার চিন্তায় খেতে পারি নি। রাতে এককোটা ঘুমাতে পারি নি। আল্লাহ্ তোমাকে আমার জোড়া করেছে বলে হয়তো তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

মা বাবাকে হারিয়ে নাদের আলি বোবার মতো হয়ে গিয়েছিল। কোনো কথা না বলে তার দিকে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। আর দু'চোখ থেকে পানি ফেলতে লাগল।

তার অবস্থা দেখে আতিকার চোখ থেকেও পানি পড়তে লাগল। এক সময় চোখ মুছে বলল, কেঁদে আর কী করবে? যা ভাগ্যে ছিল হয়েছে। এখন মন শক্ত করে সবকিছু গুছিয়ে ওঠার চেষ্টা কর। আমি তোমার জন্য আজীবন অপেক্ষা করব।

নাদের আলি চোখ মুছে ভিজে গলায় বলল, তুমি আর আমার কাছে এস না। আমাকে ভুলে যাও আতিকা, আমাকে ভুলে যাও। যা কখনও সম্ভব নয়, তার জন্য অপেক্ষা করা ঠিক নয়।

এ কথা তুমি বলতে পারলে নাদের আলি ভাই? তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে বুড়ি হয়ে যাব, প্রয়োজনে জান দেব, তবু অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না। আর তোমাকে ভুলতেও পারব না। তারপর চোখ মুছতে মুছতে সেখান থেকে চলে এল। তারপর মাঝে মাঝে চাকর হালিমকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে বিভিন্ন

জায়গায় দেখা করত। হাবিব ডাক্তারের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা বেড়ে যাওয়ার পর তার মনে হল, তাকে সব কথা জানিয়ে সমাধান চাইবে। উনি হয়তো কিছু করতে পারবেন। কারণ আব্বাও তাকে খুব মান্য করেন। এইসব চিন্তা করে আতিকা একদিন বিকেল চারটের সময় কার্পাসডাঙ্গা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেল।

তাকে দেখে হাবিব ডাক্তার অবাক হয়ে সালাম বিনিময় করে বলল, আপনি এসেছেন কেন? কাউকে দিয়ে খবর পাঠালেই তো আমি যেতাম। কার কি হয়েছে বলুন।

আতিকা বলল, কারো কিছু হয় নি। নিজের প্রয়োজনে এসেছি।

ঠিক আছে বসুন। বসার পর জিজ্ঞেস করল, কেন এসেছেন বলুন।

কিভাবে কথাটা বলবে আতিকা চিন্তা করতে লাগল।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে হাবিব ডাক্তার মনে করল, মেয়েলী অসুখের কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছে। তাই বলল, সব ধরনের অসুখের কথা ডাক্তারের কাছে বলা যায়। এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। না বললে চিকিৎসা করব কি করে?

আমি অনেক দিন থেকে একটা সমস্যায় ভুগছি। মা সমস্যাটা জেনে সমাধান করার চেষ্টা করবে বলেছিল। কিন্তু প্রায় দু'বছর হয়ে গেল কিছু করতে পারে নি। মনে হয় কোনো দিন পারবেও না। আমার বিশ্বাস আপনি পারবেন।

বেশ তো, সমস্যাটা বলুন, সমাধান করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

আপনাকে ওয়াদা করতে হবে, যা বলব তা কাউকে বলবেন না।

তার কথা শুনে হাবিব ডাক্তার যেমন অবাক হল, তেমনি কৌতূহলবোধও করল। বলল, আপনি নিশ্চিন্তে বলুন, আমি কাউকে বলব না।

আতিকা নাদের আলির সবকিছু ও তাদের দু'জনের সম্পর্কের কথা বলে বলল, আপনার সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি, তাতেই মনে হয়েছে, আপনি আমার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

হাবিব ডাক্তার কিছুক্ষণ চিন্তা করে গম্ভীর স্বরে বলল, মাত্র কয়েক মাস হল আমি এই এলাকায় এসেছি। এখানকার সব মানুষের সঙ্গে যেমন পরিচয় হয় নি, তেমনি সামাজিক রীতিনীতিও জানতে পারি নি। আপনার সমস্যার সমাধান করা খুব কঠিন। আমি বাইরের লোক। ডাক্তার হিসাবে সবাই আমাকে চেনে। সামাজিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া কি আমার উচিত হবে? তা ছাড়া আপনার আব্বাকে যতটুকু জেনেছি, তিনি ভাঙবেন তবু মচকাবেন না।

আতিকা দ্রুত হাবিব ডাক্তারকে কদমবুসি করে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলল, আমি যদি আপনার ছোট বোন হতাম, তা হলেও কি কিছু করতেন না?

তার অবস্থা দেখে হাবিব ডাক্তার বুঝতে পারল, পানি অনেক দূর গড়িয়েছে। উপদেশ দিয়ে ফেরান আর সম্ভব নয়। নেতিবাচক কিছু বললে যে কোনো দুর্ঘটনা

ঘটিয়ে ফেলতে পারে। তাই অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে, আপনি এখন বাড়ি যান। আমি কিছুদিন চিন্তা ভাবনা করে সমাধান করার চেষ্টা করব। আপনারা আর দেখা সাক্ষাত করবেন না। যদি করেন, তা হলে কিছু করতে পারব না। একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন, "আল্লাহর ইশারা ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না।" তিনি যদি আপনাদের জোড়া করে পয়দা করে থাকেন, তা হলে শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তা করাবেন। নাদের আলির সঙ্গে আমার দেখা হলে তাকেও এসব কথা বলব।

এই ঘটনা দু'তিন মাস আগের। তাই আজ হাবিব ডাক্তারকে আসতে দেখে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কতটা কি করল, জানার জন্য রাস্তায় এসে দেখা করে।

আতিকা যখন হাবিব ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিল তখন মুশতাক বিশ্বাস সদরে কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। জানালা দিয়ে মেয়েকে হাবিব ডাক্তারের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলতে দেখেছেন। লোকজন চলে যাওয়ার পর চিন্তা করলেন, আতিকা কি হাবিব ডাক্তারকে পছন্দ করে? না নিজের কোনো অসুখের ব্যাপারে আলাপ করছিল? ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হবে।

তিন

কার্পাসডাঙ্গায় বছর দুই হল নতুন হেলথ কমপ্লেক্স হয়েছে। এখানে দু'জন ডাক্তার। একজন হাবিব আর অন্যজন সাগীর। আর দু'জন নার্স ও দু'জন আয়া আছে। প্রথমে সাগীর এখানে জয়েন করে। বন্যার পর হাবিব অফিসার হিসাবে জয়েন করেছে। তারা হেলথ কমপ্লেক্স-এর কোয়ার্টারে থাকে। সাগীরের বয়স প্রায় চল্লিশ। সে ফ্যামিলী নিয়ে থাকে। তাদের শুধু একটা মেয়ে। নাম নাফিসা। সে সিক্সে পড়ে। হাবিব ডাক্তার তাদের কাছে খায়। অবশ্য সেজন্য মাসিক টাকা দেয়।

সকাল আটটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত হেলথ কমপ্লেক্সে প্রচুর রুগীর ভিড় হয়। তাদেরকে পরীক্ষা করে ওষুধপত্র দিতে দু'জন ডাক্তার হিমশিম খেয়ে যায়। বিকেলে রুগী দেখা হয় না। আর্জেন্ট কোনো রুগী এলে সাগীর দেখে। হাবিব বিকেল চারটের সময় সাইকেলে ডাক্তারী ব্যাগ ঝুলিয়ে কলে বের হয়। কল থাকুক বা না থাকুক প্রতিদিন বেরিয়ে আশপাশের গ্রামের গরিব ও দুস্থ যারা হেলথ কমপ্লেক্সে যেতে অক্ষম, তাদের চিকিৎসা করে। আজ বিকেলে কলে বেরোবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় নাদের আলি হন্তদন্ত হয়ে এসে হাঁপাতে

হাঁপাতে বলল, জলদি চলুন ডাক্তার সাহেব, পশ্চিমপাড়ায় আগুন লেগে অনেক ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে। হাশেম চাচার মেয়ে মারাত্মক আহত হয়েছে। হেড স্যার আপনাকে এক্ষুণি যেতে বলেছেন।

হাবিব ডাক্তার আতঙ্কিত স্বরে বলল, হাশেম চাচার মেয়ের কি হয়েছে তুমি দেখেছ?

জি না। আমি আগুন নেভাতে গিয়েছিলাম। পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে হেড স্যার ঐ কথা বলে আপনার কাছে পাঠালেন।

আগুন নেভান হয়েছে?

আমি যাওয়ার আগেই নেভান হয়েছে।

হাবিব ডাক্তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যাগে নিয়ে সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে বলল, তুমি এস, আমি যাচ্ছি।

কুতুবপুর মাধ্যমিক স্কুলের হেড মাস্টার আজরাফ হোসেনের বাড়ি পশ্চিমপাড়ায়। আর্থিক অবস্থা ভালো। তিনি গ্রামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। প্রায় একযুগ আগে বিয়ে করেছেন; কিন্তু আজও সন্তানের মুখ দেখেন নি। বিয়ের চার-পাঁচ বছরের মধ্যে স্ত্রীর গর্ভে সন্তান না আসায় তারই জিদে ঢাকায় গিয়ে একজন বড় ডাক্তারের কাছে দুজনেরই পরীক্ষা করান। পরীক্ষার পর ডাক্তার বললেন, "আপনাদের কারো কোনো দোষ নেই। আপনার যেমন সন্তান জন্মাবার উপাদান আছে, আপনার স্ত্রীরও তেমনি সন্তান গর্ভে ধারণ করার ক্ষমতাও আছে। অনেক সময় অনেকের দেরিতে সন্তান আসে। এজন্য দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।" তারপর আজ যে সাত বছর হতে চলল, এখনও তাদের সন্তান হয় নি। অবশ্য এজন্য আজরাফ হোসেনের কোনো মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু তার স্ত্রী তাসনিমা খাতুন সন্তানের জন্য অস্থির হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। গভীর রাতে গুমরে গুমরে কাঁদেন।

একরাতে আজরাফ হোসেনের ঘুম ভেঙ্গে যেতে স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে বললেন, কী হয়েছে? কাঁদছ কেন? কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখেছ?

তাসনিমা খাতুন চোখ মুছে বললেন, আমি এমনই হতভাগী এতদিনেও তোমাকে একটা সন্তান দিতে পারলাম না।

আজরাফ হোসেন বললেন, তুমি কী সন্তান দেয়ার মালিক? মালিক তো আল্লাহ। তাঁর ইচ্ছায় সারা মাখলুকে সব কিছু চলছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমাদেরকে সন্তান দেবেন। ইচ্ছা না হলে দেবেন না। এতে কাঁদার কি আছে? শোন, আল্লাহর ইচ্ছার উপর প্রত্যেক মানুষের, বিশেষ করে মুসলমানদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। নচেৎ ঈমান থাকবে না।

তাসনিমা খাতুন বললেন, আল্লাহ আমাদের এত কিছু দিয়েছেন, কিন্তু একটা সন্তান দিচ্ছেন না কেন?

এক্ষুনি বললাম না, সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছা? সেদিন কুরআনের তফসিরে পড়লাম, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) নামে সন্তান দিয়েছিলেন। তখন তাঁর স্ত্রীর সন্তান ধারণের বয়স পার হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আমাদের এখনও সন্তান হওয়ার সময় আছে। অত নিরাশ হচ্ছ কেন? ভাগ্যে থাকলে নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের আশা পূরণ করবেন।

চল না, তারানগর ফকিরের দরগায় গিয়ে সন্তানের জন্য মানত করে আসি।

কী বললে? ফকিরের দরগায় মানত করবে? জান না, কোনো পীরের মাজারে বা দরগায় কোনো কিছু মানত করা, সিন্নী, আগরবাতি, মোমবাতি বা টাকা-পয়সা দেয়া হারাম। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে এটা শেরেক। আর শেরেক খুব কঠিন গোনাহ। যা আল্লাহ মাফ করবেন না।

কই, এরকম কথা তো আগে কখনও শুনি নি? কত লোক তো ঐসব জায়গায় গিয়ে মানত করে।

যারা করে, তারা ইসলামের এই হুকুম জানে না। মানত করতে হলে আল্লাহর কাছে করতে হয়। আমি তাঁর কাছে করেছি, তুমিও কর। কোনো মাজারে বা দরগায় মানত করার কথা কখনো মনে আনবে না।

তওবা করছি, আর কখনও মনে করব না। আল্লাহ আমাকে মাফ করুক। তারপর মানত করল, "আল্লাহ আমাদেরকে অন্তত একটা সন্তান দাও। আমি মসজিদে এক হাজার, মাদ্রাসায় এক হাজার টাকা দান করব। আর গ্রামের গরিব এতিম ছেলেমেয়েদেরকে ঈদের সময় এক হাজার টাকার নতুন জামা-কাপড় কিনে দেব।"

আজরাফ হোসেন আমিন বলে বললেন, আল্লাহ তুমি আমার স্ত্রীর মনের কামনা কবুল কর।

মানত করার মাস দুই পর তাসনিমা খাতুন কিছু খেতে পারছেন না। খেতে গেলে ওকি হয়। জোর করে খেলে বমি হয়ে যায়। স্ত্রীর এই রকম অবস্থা দেখে আজরাফ হোসেন একজন কাজের লোককে হাবিব ডাক্তারকে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

হাবিব ডাক্তার তখন মাত্র ছ'মাস হল কার্পাসডাঙ্গা হেলথ কমপ্লেক্সে জয়েন করেছে। আজরাফ হোসেনের বাড়িতে এসে সব কিছু শোনার পর রুগীর নাড়ী পরীক্ষা করে মৃদু হেসে বললেন, আপনার স্ত্রীর পেটে সন্তান এসেছে। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন।

আজরাফ হোসেন আনন্দে কয়েক সেকেন্ড কথা বলতে পারলেন না। তারপর সামলে নিয়ে উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন, সত্যি বলছেন ডাক্তার?

হাবিব ডাক্তার বললেন, জি।

আজরাফ হোসেন ঘরের মেঝেতেই সিজদায় গিয়ে কিছুক্ষণ চোখের পানি ফেলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর সিজদা থেকে উঠে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, জানেন ডাক্তার, আজ একযুগ এই খবর শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

হাবিব ডাক্তার অবাক হয়ে বলল, এতদিন তা হলে আপনাদের কোনো সন্তান হয় নি?

তবে আর বললাম কেন, এই খবর শোনার জন্য একযুগ অপেক্ষা করছি।

তাসনিমা খাতুনও ডাক্তারের কথা শুনে ঘোমটার ভিতর চোখের পানি ফেলে আল্লাহর শোকর আদায় করছিলেন। স্বামীর কথা শেষ হতে বললেন, ডাক্তার সাহেবকে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বসান। এই শুভক্ষণে মিষ্টি মুখ করাবেন।

মিষ্টি ঘরে ছিল, বারান্দায় বসার পর একটা মেয়ে মিষ্টি নিয়ে এসে সালাম দিল।

আজরাফ হোসেন সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, কিরে, এক্ষুনি চলে এলি যে? চাচা আজ কেমন আছেন?

মেয়েটি বলল, একই রকম। তারপর আবার বলল, ভাবির শরীর খারাপ শুনে আব্বা থাকতে দিলেন না। কথা শেষ করে চলে গেল।

মেয়েলী কণ্ঠে সালাম শুনে হাবিব ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে অবাক। শাড়ি পরে থাকলেও ওড়না দিয়ে মাথা ও মুখ ঢেকে রেখেছে। শুধু চোখ দু'টো দেখা যাচ্ছে। সেই চোখের দিকে একপলক তাকাতে ডাক্তারের কলজে কেঁপে উঠল। সে বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ভুলে গেল আজরাফ হোসেন বসে আছেন। এত মায়াবী চোখ সে জীবনে দেখে নি। তার মনে হল, মেয়েটির চোখে যাদু আছে। তা ছাড়া কোনো মেয়ের গলার স্বর যে এত মিষ্টি, তাও কোনো দিন শোনে নি। মেয়েটি চলে যাওয়ার পর আজরাফ হোসেন যখন বললেন, নিন ডাক্তার, একটু মিষ্টি মুখ করে নিন তখন বাস্তবে ফিরে এল।

মিষ্টির প্লেটে চামচ থাকা সত্ত্বেও হাবিব ডাক্তার জগ নিয়ে বারান্দার কিনারে গিয়ে দু'হাত ধুয়ে এসে বিসমিল্লাহ বলে, খেতে খেতে বলল, আপনার চাচার কি হয়েছে?

আজরাফ হোসেন বললেন, উনি এক রাতে পড়ে গিয়ে স্ট্রোক করে প্রায় দু'বছর ধরে বিছানায় পড়ে আছেন। চলাফেরাও করতে পারেন না।

হাবিব ডাক্তার বলল, আল্লাহ খায়ের করুক, খুব দুঃখের ব্যাপার। তা চিকিৎসা করান নি?

হ্যাঁ, খুব দুঃখের ব্যাপারই। যীনাত, মানে যে মেয়েটা মিষ্টি নিয়ে এল, ওর জীবনটাও খুব দুঃখের। আর চিকিৎসার কথা যে বললেন, তা করান হয়েছে। এখনো হচ্ছে। কিন্তু কোনো ফল হয় নি।

সব কিছু আল্লাহর মর্জি। আমি আপনার চাচাকে একটু পরীক্ষা করব। তার আগে ওঁর সম্পর্কে সবকিছু জানতে চাই।

সবকিছু বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। সময়ও নষ্ট হবে আপনার।

তা হোক, তবু শুনব। সবকিছু না জানলে চিকিৎসা করব কী করে?

তার আগে আমার একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছা করছে।

এমন সময় যীনাত দু'কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে ফিরে এলে হাবিব ডাক্তার তার চোখের দিকে তাকাবার জন্য মনে প্রচণ্ড চাহিদা সত্ত্বেও তাকাল না। চলে যাওয়ার পর বলল, বলুন কি জানতে চান?

চামচে খাওয়া ডাক্তারী মতে নিষেধ; না ইসলামে নিষেধ, না এটা আপনার গোঁড়ামী?

ভাইয়ার কথা শুনে ডাক্তার কি বলে শোনার জন্য যীনাত দরজার বাইরে এসে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হাবিব ডাক্তার বলল, কোনোটাতেই নিষেধ নেই। আর এটা গোঁড়ামীও নয়। আসল ব্যাপার হল, ইসলামের প্রতিটি বিধান বিজ্ঞান ভিত্তিক ও ইহকাল ও পরকালের ভালোর জন্যই। তাই মুসলমানদের প্রতিটি কাজ, যেমন খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, শোয়া-বসা, সভা-সমিতি, আচার-আচরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, এমন কি পেশাব-পায়খানা থেকে স্ত্রী মিলন পর্যন্ত ধর্মের নিয়মানুসারে করা উচিত। এতে করে কিন্তু এইসব কাজ এতটুকু বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে না। আর একটা জিনিস হল, মুসলমানদের প্রতিটি কাজ ইবাদত। তবে কিভাবে প্রতিটি কাজ করলে ইবাদত হবে, তা তাদেরকে জানতে হবে। একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। যেমন ধরুন, আপনি ভাত খাবেন, ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে, খাওয়ার আগে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ভালো করে ধুবেন। খাওয়া শুরু করার আগে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলে সামান্য লবণ নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে মুখে দেবেন। তারপর নিজ পাশ থেকে ভাত নিয়ে মুখে দেয়ার আগে বলবেন, "বিসমিল্লাহি ওয়া আয়ালা বারকাতিল্লাহি।" এর অর্থ হল, আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং এই খাবারে আল্লাহ তুমি বরকত দান কর। তারপর অল্প অল্প ভাত মুখে দিয়ে ভালো করে চিবিয়ে খাবে। পেট পুরে না খেয়ে আধপেট খাবে। বাকি অর্ধেকের একভাগ পানি দিয়ে পূর্ণ করবে। আর একভাগ খালি রাখবে। খাওয়ার পর প্লেটে ও হাতে লেগে থাকা খাবার জিহ্বা দিয়ে চেটে খেতে হবে। তারপর প্লেটে হাত না ধুয়ে আলাদা পাত্রে অথবা অন্যখানে আবার দু'হাত ভালো করে

ধুতে হবে। শেষে পানি খেয়ে বলতে হবে, "আলহামদুলিল্লাহিল্লাজী আতআ'মানা ওয়া শাকায়না ওয়াজ আলনা মিনাল মুসলেমিন।" এর অর্থ হল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে খাবার খাওয়ালেন, পানি পান করালেন ও মুসলমান দলভুক্ত করেছেন। যিনি আহার দিলেন, আহারের পর তাঁর প্রশংসা বা গুণগান করাই তো উচিত।

শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য আমরা খাওয়া-দাওয়া করি। ধর্মীয় নিয়মে না খেলেও খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা মিটবে ঠিক, কিন্তু ইবাদত হবে না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কিন্তু খাওয়ার ধর্মীয় নিয়মগুলো অতি উত্তম। আরো একটু খোলাসা করে বলি, খাওয়ার আগে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য দু'হাত ধুতে বলা হয়েছে। এক হাতে নিশ্চয় তা সম্ভব নয়। তারপর অল্প একটু লবণ মুখে দেওয়ার উদ্দেশ্য জিবের লালা বের করা। এই লালাই আমাদের খাদ্য হজম করে। অল্প অল্প খাবার মুখে দিয়ে ভালো করে চিবানো মানে খাবারের সঙ্গে ঐ লালা বেশি করে মিশে যায় এবং হজমের সহায়তা করে। তারপর প্লেট ও হাত চেটে খাওয়া মানে অধিক পরিমাণ জিহ্বা থেকে লালা বের করা। যা নাকি হজমের জন্য লাগে। শেষে আবার দু'হাত ধোবার অর্থ, এক হাতে ভালো করে ধোয়া হয় না। এখন আপনিই বলুন, কেউ যদি ধর্মীয় নিয়মে খাওয়া-দাওয়া করে, তাকে কী গোঁড়া বলবেন?

আজরাফ হোসেনকে না সূচক মাথা নাড়তে দেখে হাবিব ডাক্তার বললেন, এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। ধর্মীয় বিধান মানুষের জন্য কত মঙ্গলময়? আরো একটা জিনিস নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, মুসলমানদের যে কোনো কাজের ফলাফল দু'টো। একটা ইহলৌকিক আর অন্যটা পারলৌকিক? ইসলামের বিধান প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত। যেমন—ফরয, ওয়াজীব ও সুন্নত। অবশ্য নফল, মোস্তাহাবের কথাও ইসলামে উল্লেখ আছে। সেগুলো করলে সওয়াব আর না করলে কোনো দোষ নেই। ফরয হল, শরীয়তের বিধানানুসারে যে সকল বিষয় কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য প্রমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে এবং অবশ্য পালন করতে হবে, উহাকে ফরয বলে। ফরয পালন না করলে কবীরা গুনাহ্ হয় এবং অস্বীকার করলে কাফের হয়। ওয়াজীব হল, যে সকল শরীয়ত বিধান অস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হলেও অপরিহার্য বলে নির্ধারিত হয়েছে, উহাকে ওয়াজীব বলে। আর সুন্নত হল, যা করার জন্য হযরত নবী করিম (দঃ) তাগিদ দিয়াছেন এবং নিজে সদা সর্বদা তা করেছেন। তবে কোনো মুসলমানদের উচিত নয়, রাসুল (দঃ) এর সুন্নতকে ছোট মনে করা অথবা অবহেলা করা। তা না হলে পূর্ণ মুসলমান হতে পারবে না। কারণ আল্লাহ কুরআন পাকে বহু জায়গায় বলেছেন, "আল্লাহকে ও তাঁর রাসূল (দঃ) কে অনুসরণ কর।" অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

(দঃ) এর বিধান মেনে চল। আরো বলেছেন, "হে রাসূল বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তা হলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন।"[১]

এবার চামচে না খেয়ে হাতে খাওয়ার ব্যাপারে বলছি। রাসূল (দঃ) কখনও চামচে খান নাই, হাতে খেয়েছেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করেছি মাত্র। এটা তখনই গোঁড়া হত যদি আপনাকেও হাতে খাওয়ার জন্য জোর জবরদস্তি করতাম। আপনি জানেন কিনা জানি না, ইসলামে কিন্তু জোর জবরদস্তির স্থান নেই।

আজরাফ হোসেন বললেন, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দোষ কোথায় বলুন? মৌলবীরা শুধু সওয়াব হাসিল করার জন্য কুরআন-হাদিস থেকে বয়ান করেন। তাঁরা যদি আপনার মতো সওয়াবের সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলোও দেখাতেন, তা হলে ইসলামের কোনো কাজকেই মুসলমানরা অবহেলা করত না। এবং যারা ইসলামের অনুসারী তাদেরকে কেউ গোঁড়া বলতে পারত না।

হাবিব ডাক্তার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, আপনার কথাই ঠিক। আলেমদের এই ভুলের জন্য সারাবিশ্বে মুসলমানরা আসল ইসলাম থেকে বঞ্চিত হয়ে সওয়াব কামাবার জন্য শুধু খোলস নিয়ে টানাটানি করছে। আর সেইজন্য তারা বিশ্বের কাছে সাম্প্রদায়িক আখ্যা পাচ্ছে। অথচ ইসলামে সাম্প্রদায়িকতার এতটুকু স্থান নেই।

আজরাফ হোসেন বললেন, আপনি খুব দামী কথা বলেছেন। তারপর বললেন, আমি আশ্চর্য হচ্ছি, আপনি একজন ডাক্তার হয়ে ইসলামের এত জ্ঞান অর্জন করলেন কি করে? আপনি তো আর মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রী নেন নি?

হাবিব ডাক্তার মৃদু হেসে বলল, মাদ্রাসায় না পড়লেও প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। আর সে জন্যে আমাদের স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটির সিলেবাসে ইসলামী বই পাঠ্য করা উচিত। এটা করা হয় নি বলেই স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটি থেকে যারা ডিগ্রী নিয়ে বেরোচ্ছে, তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতে পারছে না। তাই ইসলামের প্রতি তারা এত উদাসীন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এবার এসব কথা থাক। আপনার চাচার কথা বলুন, শোনার পর ওঁকে একটু দেখে যাব।

যীনাত এতক্ষণ তাদের কথা শুনছিল। এবার ভিতরে ঢুকে নাস্তার প্লেট ও চায়ের কাপ নিয়ে চলে গেল।

---

১. সূরা : আল ইমরান, আয়াত—২৯, পারা—৩

আজরাফ হোসেন যীনাতের দিকে তাকিয়েছিলেন। বেরিয়ে যেতে বললেন, জানেন ডাক্তার, একে নিয়ে আমার খুব দুশ্চিন্তা। হাশেম চাচা, মানে যীনাতের বাবা ওর দুইবার বিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথমবার বিয়ের রাতে জামাই সাপের কামড়ে মারা যায়। বছর খানেক পরে আমি উদ্যোক্তা হয়ে আবার বিয়ে দিলাম। যীনাত দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে রাজি ছিল না। আমিই অনেক বুঝিয়ে রাজি করিয়েছিলাম। বৌ নিয়ে বর ও বরযাত্রী ফিরে যাওয়ার সময় পথে ঝড়-বৃষ্টি হয়। সেই সময় বজ্রপাতে ঐ জামাইও মারা যায়। এরপর থেকে ওকে গ্রামের সবাই অপয়া মেয়ে বলে। যীনাতও নিজেকে অপয়া ভাবে। আমি আবার ওর বিয়ে দিতে চাই; কিন্তু কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। আমার স্ত্রীকে বোঝাতে বলেছিলাম, রাজি না হয়ে বলেছে, আমার তকদীরে স্বামী নেই। যদি থাকত, তা হলে দু'দুটো স্বামী বিয়ের রাতে মারা গেল কেন? আবার যার সঙ্গে বিয়ে হবে সে যদি মারা যায়, তা হলে এ মুখ কাউকে দেখাতে পারব না। এমনই তো সবাই আমাকে অপয়া বলে। অথচ ওর মতো সুন্দরী ও গুণবতী মেয়ে দ্বিতীয় আর কেউ আছে কিনা জানা নেই। চাচী আম্মা, মানে ওর মাও খুব সুন্দরী, গুণবতী, ধার্মিক ও পর্দানশীল ছিলেন। হাশেম চাচা আমার থেকে চার পাঁচ বছরের বড় হলেও আমাদের মধ্যে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক। আমি তো সম্পর্কে চাচী আম্মার ছেলে, তবু তিনি আমার সামনে আসতেন না। কথা বললে পর্দা করে বলতেন। গ্রামের কেউ তার পা পর্যন্ত দেখে নি। কোথাও গেলে বোরখা পরে হাতে পায়ে মোজা পরে যেতেন। আমার মা তাকে খুব ভালবাসতেন। মায়ের কাছে রাতে আসতেন। মায়ের কাছে তার সবকিছু শুনেছি। মা বলতেন, হাসেমের বৌ আল্লাহর খাস বান্দি। একটা ঘটনা বলছি শোন, তুই তখন আমার কোলে দু'বছরের। সেই সময় হাসেমের রান্নাঘরে আগুন লাগে। সেখান থেকে তাদের শোবার ঘরের চালে আগুন লাগে। হাশেম আলি ঘরে ছিল না। গ্রামের লোকজন আগুন নেভাতে এসে দেখল, শোবার ঘরের চালের আগুন ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। সবাই অবাক হয়ে আগুন নিভে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিরে গেল। আশপাশের বাড়ির মেয়েরা হাশেম আলির বৌ-এর খোঁজ করে না পেয়ে ঘরের বন্ধ দরজা আঘাত করে ডাকতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর বৌটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। মেয়েরা বলল, তোমার ঘরের চালে আগুন লেগেছে আর তুমি দরজা বন্ধ করে ঘরে রয়েছ। এ কেমন কথা? বৌটা চুপ করে রইল। অনেকে ঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখল, নামায পাটি বিছানো রয়েছে। যখন অনেকবার প্রশ্ন করেও উত্তর পেল না তখন তারা ফিরে গেল। কথাটা শুনে কয়েকদিন পর আমি হাশেমের বৌকে ডেকে পাঠালাম। আসার পর ঘটনাটা জিজ্ঞেস করলাম। বলল, ঘরের চালে আগুন লেগেছে দেখে ভাবলাম, লোকজন

যখন নেভাতে আসবে তখন আমি পর্দা রক্ষা করতে পারব না, তাই তাড়াতাড়ি অযু করে ঘরের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে নামাযপাটি বিছিয়ে সিজদায় গিয়ে কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে জানালাম, "আমি বেপর্দার ভয়ে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি আমাকে রক্ষা কর। তোমার ইশারাতেই আগুন লেগেছে। তুমি ইচ্ছা করলে নিভাতে পার। নমরুদ যখন হযরত ইবরাহিম (আঃ) কে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়েছিল তখন তুমি সেই অগ্নিকুণ্ডকে ফুলের বাগান করে দিয়েছিলে। ইচ্ছা করলে তুমি আমাদের ঘরের আগুন নিভিয়ে দিতে পার। অথবা আমাকেসহ এই ঘর পুড়িয়ে দিতে পার। আমি তোমার কাছে নিজেকে সোপর্দ করলাম। আরো অনেক কিছু বলে কান্নাকাটি করতে লাগলাম। তাঁর অপার করুণায় ও কুদরতে ঘরের আগুন আপনা থেকে নিভে যায়।" চাচী আম্মা কিভাবে মারা যান বলছি শুনুন, যীনাতের বয়স তখন দশ কি বার, একদিন রাত তিনটের সময় চাচী আম্মা তাহাজ্জুদের নামায পড়ার সময় সিজদায় গিয়ে মারা যান। তারপর চাচা আর বিয়ে করেন নি। যীনাত মায়ের সবগুণ পেয়েছে। প্রাইমারীতে বৃত্তি পেয়েছিল। চাচী আম্মা আর পড়াতে চান নি। আমিই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাইস্কুলে ভর্তি করি। এখন যেভাবে ওড়না পরেছে দেখলেন; ক্লাস সিক্স থেকে ঐভাবেই ওড়না পরে স্কুলে যেত। এস.এস.সি.তেও মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে পাশ করেছিল। ওকে দামুড়হুদা ওদুদশাহ কলেজে ভর্তি করতে চেয়েছিলাম। যীনাত রাজি হল না। বলল, বাসে লোকজনের গা ঘেষা-ঘেষি করে যাতায়াত করতে পারবে না। হাশেম চাচার অবস্থা তখন স্বচ্ছল ছিল। উনিও খুব ধার্মিক। স্ট্রোক করে প্রথমদিকে একু-আধটু চলাফেরা করতে পারতেন। কিছুদিন থেকে তাও পারেন না। উনি বেঁচে থাকতে যীনাতের আবার বিয়ে দিতে চান। আমিও চাই; কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। কথায় আছে, বসে বসে খেলে রাজার ধন ভাণ্ডারও শেষ হয়ে যায়। হাশেম চাচা জমি-জায়গা বিক্রি করে এতদিন সংসার চালিয়েছেন, নিজের চিকিৎসা করিয়েছেন। এখন একদম নিঃস্ব। বাস্তুভিটা ছাড়া কিছুই নেই। আমি ওদেরকে যতটা পারি সাহায্য করি। যীনাত সারাদিন আমাদের সংসারে কাজকর্ম করে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘরে গিয়ে বাপের সেবা করে। ওরা সবাই এত ধার্মিক, তবু কেন আল্লাহ ওদের উপর এত বিপদ দিলেন বলতে পারেন?

হাবিব ডাক্তার বললেন, যারা বেশি ধার্মিক তাদেরকে আল্লাহ কঠিন কঠিন বিপদে ফেলে পরীক্ষা করেন। এর বেশি কিছু বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। আজ আর নয়, চলুন, আপনার চাচাকে দেখে তারপর যাব।

আজরাফ হোসেন একটু উঁচু গলায় বললেন, যীনাত, এদিকে একটু আয় তো বোন।

যীনাত রান্না করছিল। ভাইয়ার কথা শুনে এসে একপাশে দাঁড়াল।

আজরাফ হোসেন বললেন, চাচাকে ডাক্তার দেখবেন। তুই ঘরে যা। আমরা আসছি।

হাবিব ডাক্তার হাশেম আলিকে পরীক্ষা করে বলল, আজরাফ স্যারের কাছে আপনার সব কথা শুনেছি। আমার যতদূর বিশ্বাস আপনি মানসিক দিক দিয়ে খুব ভেঙ্গে পড়েছেন। আর মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করেন। অবশ্য এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। তবু বলব আপনি ধার্মিক লোক হয়ে এতটা ভেঙ্গে পড়া ঠিক হয় নি। জানেন তো, সবকিছু আল্লাহর মর্জিতেই হয়। তাঁর মর্জির উপর সন্তুষ্ট থাকা মুমীন মুসলমানদের কর্তব্য। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের কঠিন কঠিন বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। নবী হযরত আইয়ুব (আঃ) এর কথা জানেন বোধহয়? তাঁকে আঠার বছর কুষ্ঠ রোগ দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। শুধু তাই নয় তাঁর বাণিজ্যিক জাহাজগুলো ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েদের মৃত্যু দিয়েছিলেন। শেষে বাড়ি ছাড়া করে জঙ্গলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এতকিছু সত্ত্বেও হযরত আইয়ুব (আঃ) আল্লাহর উপর এতটুকু অসন্তুষ্ট হন নি। বরং সব সময় তাঁর জিকিরে মশগুল থাকতেন। তিনি পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাঁকে ব্যাধিমুক্ত করেন এবং ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দেন ও ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে দেন। আমি আপনার চিকিৎসা করব। আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে বুকে সাহস রাখুন। তাঁর কাছে গুনাহ খাতা মাফ চেয়ে রোগ মুক্তির জন্য কান্নাকাটি করুন। আর সবর করার তওফিক চান। ইনশাআল্লাহ আপনি কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবেন। আর আপনার মেয়ের জন্য এতটুকু দুশ্চিন্তা করবেন না। আল্লাহ প্রত্যেকের ভাগ্য নির্ধারণ করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। কোনো মানুষই তা পরিবর্তন করতে পারবে না। একথা আপনি জেনেও কেন তার জন্য এত দুশ্চিন্তা করেন? আমি মাঝে মাঝে আপনাকে দেখতে আসব। আজই ওষুধ পাঠিয়ে দেব। খাওয়ার নিয়ম কাগজে লিখে দেব। ঠিকমতো ওষুধগুলো খাবেন। তারপর আজরাফ হোসেনকে বলল, কাউকে পাঠাবেন, তার হাতে ওষুধগুলো দিয়ে দেব।

আজরাফ হোসেন বললেন, আপনাকে ওষুধ পাঠাতে হবে না। আপনি প্রেসক্রিপশন করে দিন, আমি কিনে নেব।

হাবিব ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করে দিয়ে বলল, ওষুধগুলো এখানে পাবেন কিনা জানি না, যদি না পান, ঐ লোককে আমার কাছে যেতে বলবেন। তারপর যীনাতের দিকে তাকিয়ে বলল, একটা বোতলে পানি ভরে নিয়ে আসুন।

যীনাত বোতলে পানি ভরে নিয়ে এলে আজরাফ হোসেনকে বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনি ওকে নিয়ে ঘরে চলে যান। আমি ইনার সঙ্গে কিছু আলাপ করে চলে যাব।

আজরাফ হোসেন একটু অবাক হলেও কিছু না বলে যীনাতকে নিয়ে চলে গেলেন।

হাবিব ডাক্তার হাশেম আলিকে জিজ্ঞেস করল, প্রায় প্রতিরাতে আপনার স্ত্রীকে স্বপ্নে দেখেন তাই না?

হাশেম আলি অবাক হয়ে বললেন, হ্যাঁ দেখি।

কি অবস্থায় ওঁকে দেখেন?

আমি যেন এই খাটে শুয়ে আছি, আর আমার স্ত্রী ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞেস করি, কাঁদছ কেন? কোনো উত্তর না দিয়ে কাঁদতেই থাকে। কাছে আসতে বললেও আসে না।

আমি খাট থেকে নেমে কাছে গেলে তাকে আর দেখতে পাই না।

প্রায় প্রতি রাতে একই স্বপ্ন দেখেন তাই না?

হ্যাঁ তাই।

হাবিব ডাক্তার বিড় বিড় করে কিছু পড়ে হাশেম আলির গায়ে ও বোতলের মুখে ফু দিল। তারপর বলল, সকালে ও সন্ধের পর বোতলের পানি এক ঢোক করে খাবেন। আর রাতে ঘুমাবার সময় হাতে অল্প একটু পানি নিয়ে চোখে মুখে দেবেন। তা হলে স্বপ্নে আর আপনার স্ত্রীকে দেখবেন না। আবার বলছি, যীনাতের ব্যাপারে কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। ইনশাআল্লাহ্ আপনি কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন। আল্লাহর ইচ্ছায় পাত্র নিজেই বিয়ের প্রস্তাব দেবে। এবার আসি, কয়েকদিন পর আসব। আর শুনুন, এসব কথা কাউকে বলবেন না। এমন কি আজরাফ স্যার বা আপনার মেয়েকেও না। কথাটা খুব খেয়াল রাখবেন বলে হাবিব ডাক্তার সালাম বিনিময় করে চলে গেল।

কয়েক মাসের মধ্যে হাশেম আলি সম্পূর্ণ না হলেও বেশ কিছুটা সুস্থ হয়েছেন। হাঁটাচলা করতে পারেন। পাড়ার পাঞ্জেগানা মসজিদে নামায পড়তে যেতে পারেন। জুম্মা মসজিদ বিশ্বাস পাড়ায়। দূর বলে জুম্মা পড়তে যেতে পারেন না। হাবিব ডাক্তারের চিকিৎসায় পঙ্গু হাশেম আলি চলাফেরা করতে পারে জানার পর সারা গ্রামের মানুষের কাছে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

আজরাফ হোসেন গ্রামের সবার মতো তাকে একজন ভালো ডাক্তার ও কামেল লোক মনে করেন। তার অনুরোধে হাবিব ডাক্তার প্রতি মাসে একদিন এসে তাসনিমা খাতুনকে চেকআপ করে। সেই সাথে হাশেম আলিকেও করে।

হাবিব ডাক্তারের সব কিছু দেখে শুনে যীনাত মুগ্ধ। বর্তমান যুগে এরকম মানুষও থাকতে পারে, তা তাকে না দেখলে বিশ্বাস করত না। চব্বিশ-ঘণ্টা তার কথা ভাবে। আব্বাকে দেখতে এলে যতটুকু পারে ভালো আপ্যায়ন করাবার চেষ্টা করে। সে সময় একে অপরের ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করে। তার সম্পূর্ণ পরিচয় জানার খুব ইচ্ছা হয় যীনাতের। ইচ্ছাটাকে জোর করে দমন করে রাখে।

গত মাসে যখন হাবিব ডাক্তার হাশেম আলিকে দেখতে এসে সুযোগ পেয়ে যীনাতকে বলেছিল, আজরাফ স্যারের কাছে আপনাদের সবকিছু শুনেছি, আপনি যে আর বিয়ে কতে চান নি ও নিজেকে অপয়া ভাবেন, তাও শুনেছি। এটা কিন্তু ঠিক নয়। দুনিয়াতে অনেক মুসলিম মহিয়সী নারী ছিলেন, যাঁরা একটা, দু'টো, এমনকি তিনটে স্বামী মারা যাওয়ার পরও নিজেদেরকে অপয়া না ভেবে আবার বিয়ে করেছেন। আর ধর্মে এ ব্যাপারে কোনো নিষেধও নেই।

উত্তরে যীনাত বলেছিল, সেইসব মুসলিম মহিয়সী নারীদের জীবনী পড়েছি এবং স্বামী তালাক দিলে অথবা মারা গেলে ধর্মেও যে দ্বিতীয় তৃতীয় অথবা চতুর্থ বিয়ে করতে নিষেধ নেই, তাও জানি। ঐসব মহিয়সী নারীরা উপযুক্ত পাত্র পেয়েছিলেন, তাই একটা, দু'টো এমনকি তিনটে স্বামী মারা যাওয়ার পর আবার বিয়ে করেছিলেন।

হাবিব ডাক্তার অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, কোনো উপযুক্ত পাত্র যদি বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তা হলে?

আমার তো মনে হয় অপয়া মেয়ে বলে আমার যে অপবাদ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, জেনেশুনে কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে না। আর যদি না জেনে কেউ আসে, তবে তাকে জানিয়ে দেব। তখন নিশ্চয় সে প্রস্তাব ফিরিয়ে নেবে।

ধরুন কেউ জেনেশুনে প্রস্তাব দিল, তখন?

তখন যদি পাত্রকে উপযুক্ত মনে করি, তা হলে অন্য কথা।

সেদিন আর কিছু না বলে হাবিব ডাক্তার ফেরার সময় চিন্তা করেছিল, একসময় আজরাফ স্যারকে যীনাতকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে। কিন্তু সময় সুযোগের অভাবে দেয়া হয় নি। কয়েকদিন আগে তার স্ত্রীকে চেকআপ করতে গিয়ে চা-খাওয়ার সময় বলল, স্যার, আপনি যদি অভয় দেন, তা হলে একটা কথা বলতে চাই।

আজরাফ স্যার এতদিনে হাবিব ডাক্তারকে খুব সৎ, ধার্মিক ও সাহসী বলে জেনে এসেছেন। তাই আজ তার কথা শুনে বেশ অবাক হয়ে বললেন, অভয় দেয়ার কথা বলছেন কেন বুঝতে পারছি না।

না, মানে আমি তো বাইরের লোক, কথাটা আপনাদের আত্মীয় সম্পর্কে। শুনে যদি আমাকে ভুল বোঝেন, তাই বলে থেমে গেল।

আজরাফ হোসেন আরো অবাক হয়ে বললেন, আপনাকে ভুল বুঝবো ভাবলেন কী করে? আপনি নিশ্চিন্তে বলুন।

যীনাত কি এখানে আছে?

হাবিব ডাক্তারের মুখে যীনাতের নাম শুনে আজরাফ হোসেন আর একবার অবাক হলেন। কারণ এর আগে কখনও তার মুখে শোনেন নি। বললেন, না নেই। ওদের ঘরে গেছে।

আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। তবে খুব গোপনে। আপনারা দু'জন, আপনার চাচা, বিশ্বস্ত একজন লোক ও যিনি বিয়ে পড়াবেন, এই পাঁচজন ছাড়া অন্য কেউ যেন জানতে না পারে।

আজরাফ হোসেন এত অবাক হলেন যে, অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। সেই সাথে আনন্দিতও কম হলেন না। ভাবলেন, আল্লাহ্ যীনাতকে এর সঙ্গে জোড়া করে রেখেছিলেন বলে হয়তো তার দু'বার বিয়ে হলেও কোনো স্বামীই তাকে স্পর্শ করার সুযোগ পায় নি। আর এই জন্যই বোধহয় আল্লাহ্ হাবিবকে ডাক্তার করে এই এলাকায় পাঠিয়েছেন।

তাকে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে হাবিব ডাক্তার বলল, কথাটা বলে বোধহয় ভুল করে ফেলেছি, অনুগ্রহ করে মাফ করে দিন।

আজরাফ হোসেন মৃদু হেসে বললেন, আপনি ভুল করেন নি। আল্লাহর কুদরতের কথা চিন্তা করছিলাম। আপনার কথা শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমার স্ত্রীকে দিয়ে আপনার কথা যীনাতকে জানাব। যদি রাজি না হয়, আমি বোঝাব। এবার আমি একটা কথা বলব, রাখবেন বলুন।

হাবিব ডাক্তার মৃদু হেসে বলল, আমার পরিচয় জানতে চাইবেন তাই না?

আজরাফ হোসেন আবার অবাক হলেন। বললেন, কি করে বুঝলেন?

বোঝার আর অসুবিধে কোথায়? পাত্রের সবকিছু না জেনে কি মেয়ের গার্জেনরা বিয়ে দেন? না দেয়া উচিত?

আজ কিন্তু আপনি বারবার আমাকে অবাক করছেন?

হাবিব ডাক্তার আবার মৃদু হেসে বললেন, আমার পরিচয় শুনলে তো আবার অবাক হবেন।

তাই না কি? তা হলে দেরি না করে বলে ফেলুন।

তার আগে আপনাকে ওয়াদা করতে হবে, যা শুনবেন, তা কাউকে বলবেন না।

ঠিক আছে, ওয়াদা করলাম, আপনি বলুন।

হাবিব ডাক্তার অল্প সময় চুপ করে থেকে বলল, খাঁপাড়ার নাদের আলির পূর্ব-পুরুষদের সময় থেকে বিশ্বাসপাড়ার মুশতাক বিশ্বাসদের শত্রুতা কেন বলতে পারেন?

আজরাফ হোসেন বললেন, মায়ের কাছে শুনেছি, মুশতাক বিশ্বাসের দাদা হারুন বিশ্বাস খাঁয়েদের একটা মেয়েকে ভালবেসে গোপনে বিয়ে করেছিলেন। সে বিয়ে হারুন বিশ্বাসের বাবা রহিম বিশ্বাস মেনে নেন নি এবং ঐ বৌকে ঘরেও

তুলেন নি। কিন্তু হারুন বিশ্বাস বাবার অগোচরে স্ত্রীর কাছে যাতায়াত করতেন। আর স্ত্রীকে ও তার বাপ-চাচাদের বলতেন, বাবার রাগ পড়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলে খাঁপাড়ায় যাতায়াত করে জেনে রহিম বিশ্বাস তার আবার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ততদিনে ঐ মেয়ের একটা ছেলে হয়েছে। তখন তার বয়স দুই মাস। হারুন বিশ্বাস আবার বিয়ে করবে শুনে খাঁয়েরা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বাস বাড়িতে এসে প্রতিবাদ করেন এবং বৌ ঘরে তুলে নিতে বলেন। রহিম বিশ্বাস খাঁয়েদের যা তা বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিতে চাইলে উভয় পক্ষ তর্ক-বিতর্কে মেতে উঠেন। এক পর্যায়ে রহিম বিশ্বাস রেগে গিয়ে মেয়ের বাবাকে গুলি করেন। কিন্তু তার আগে মেয়ে বাবার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং গুলি খেয়ে মারা যায়। তারপর অনেক দিন মামলা মোকদ্দমা চলেছিল। খাঁয়েদের থেকে বিশ্বাসরা অনেক বেশি ধনী। টাকার জোরে তারা মামলায় জিতে গেলেন। মেয়েটার যে দুই মাসের ছেলে ছিল, তাকে আর এক খালা নিয়ে গিয়ে মানুষ করে। সেই ছেলে বড় হয়ে সেখানেই বিয়ে শাদী করে থেকে যায়। সে আর এই গ্রামে ফিরে আসে নি। এই পর্যন্ত বলে আজরাফ হোসেন বললেন। কিন্তু আপনি এসব কথা জানতে চাইলেন কেন?

হাবিব ডাক্তার বলল, আপনি যে মেয়ে ও তার দুই মাসের ছেলের কথা বললেন, তারা হলেন আমার বড় মা ও দাদাজী।

আজরাফ হোসেন চমকে উঠে অবাককণ্ঠে বললেন, কী বলছেন আপনি?

এতটুকু শুনেই চমকে উঠলেন? এরপর যা বলব, শুনে তা হলে কী করবেন? বলছি শুনুন,

আমি যখন বিদেশ থেকে বড় ডাক্তার হয়ে ফিরে এলাম তখন দাদাজী একদিন আমাকে তার মা-বাবার পরিচয় ও মায়ের করুণ মৃত্যুর কথা বলে বললেন, তোর বাবাকে প্রতিশোধ নিতে বলেছিলাম। সে তখন বলছিল নেবে। কিন্তু আজও কিছুই করে নি। সে শুধু টাকার পেছনে ঘুরছে। তোর বাবা যে কাজ করে নি, এখন তুই যদি সেই কাজটা করিস, তা হলে শান্তি পেতাম।

বললাম, ঠিক আছে দাদু, আমি আব্বার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করে আপনাকে জানাব।

দাদাজী বললেন, তার সঙ্গে যা আলাপ করার আমিই করব। তুই ওয়াদা কর, কাজটা করে আমাকে শান্তি দিবি? আমাকে আমার খালা মানুষ করেছেন। তিনি মারা যাওয়ার সময় বলেছিলেন, তুই তো তোর মায়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারলি না, তোর ছেলেকে বলিস, সে যেন নেয়। কি জানিস, মায়ের মৃত্যুর কথা মনে পড়লে আজও বুকের ভিতর দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠে। আল্লাহ আমাদেরকে অনেক অর্থ সম্পদ দিয়েছেন। তোর বাবা ও তোর তিন ভাই

টাকার পাহাড় জমাচ্ছে। তুইও যেন তাদের মতো টাকার পিছনে ঘুরিস না। আমি চাই, তুই সেই টাকার কিছু অংশ প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরিব মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও তাদের উন্নতির জন্য এবং ইসলামের খিদমতে খরচ করবি। বড় ডাক্তার যখন আল্লাহ তোকে করেছেন তখন কুতুবপুরের মতো অজপাড়াগাঁয়ে গিয়ে গরিবদের চিকিৎসা কর। আর সেই সাথে আমার মায়ের খুনের প্রতিশোধ নিবি। বাকি আমার মায়ের ও আমার পৈত্রিক সম্পত্তি পাওয়ার ব্যবস্থা তোর বাবাকে দিয়ে করাব। আমি খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি, মুশতাক বিশ্বাসের একটা অবিবাহিত অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে আছে। তাকে তুই ছলেবলে কৌশলে বিয়ে করে তোর বড়মার হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে বিশ্বাসদের অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দিবি। বল দাদু, তুই আমার বুকের আগুন নেভাবি? তারপর চোখ মুছে বললেন, চুপ করে আছিস কেন? তুই ও কী তোর বাবার মতো আমার কথা না শুনে টাকার পিছনে ঘুরবি?

বড়মার মর্মান্তিক মৃত্যুর কারণ জেনেও দাদাজীর চোখের পানি দেখে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। বললাম, হ্যাঁ দাদাজী, আব্বা আপনার কথা না রাখলেও ইনশাআল্লাহ আমি রাখব। ওয়াদা করছি, আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও বড় মায়ের হত্যার প্রতিশোধ নেব এবং আপনার অন্যান্য মনের বাসনা পূরণ করব।

দাদাজী আলহামদুলিল্লাহ বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই শুধু মুশতাক বিশ্বাসের মেয়েকে বিয়ে করবি। আর বাকি কাজগুলোও আমি তোকে দিয়েই করাব। এতে তোর জীবনের উপর ঝুঁকি আসবে। ভয় করবি না। আল্লাহর উপর সবকিছুতে সব সময় ভরসা রাখবি। আর আমি তোর বড় ভাইয়ের দ্বারা তোকে প্রটেকশন দেয়ার ব্যবস্থা করব।

দাদাজী কিছু দিনের মধ্যে এখানে পোস্টিং করার ব্যবস্থা করে দিলেন। এখানে আসার দু'এক মাসের মধ্যে মুশতাক বিশ্বাসের মেয়ে আতিকাকে পাওয়ার পথে কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলাম। কিন্তু যখন জানতে পারলাম, আতিকা খাঁপাড়ার বড় মায়ের বংশের নাদের আলিকে স্কুল জীবন থেকে ভালবাসে এবং নাদের আলিও তাকে ভালবাসে তখন ভাবলাম, আল্লাহ খাঁ বংশের গরিব ও এতিম ছেলেকে দিয়েই বিশ্বাসদের সম্মানে আঘাত হানতে চান। তখন ঐ পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যাতে করে ওদের বিয়ে হতে পারে সেই পথে অগ্রসর হচ্ছি। জানি না, আল্লাহ কতদিনে আমার মনের আশা পূরণ করবেন। অনুগ্রহ করে আর কোনো প্রশ্ন করবেন না, উত্তর দিতে পারব না।

সবকিছু শুনে আজরাফ হোসেন এত অবাক হলেন যে, কথা বলতে ভুলে গেলেন। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, বেশ, কোনো প্রশ্ন করব

না। তবে একটা প্রশ্ন না করে পারছি না। ধরুন, নাদের আলির সঙ্গে আতিকার বিয়ে হল। তারপর যদি আপনার দাদাজীর মায়ের মতো ঘটনা নাদের আলির জীবনে ঘটে।

আল্লাহ্‌র মর্জি থাকলে ঘটবে। তবে আমার বিশ্বাস তা ঘটবে না। তার আগেই আমি মুশতাক বিশ্বাসকে আমার পরিচয় জানিয়ে বড় মায়ের ও দাদাজীর সম্পত্তি দাবি করব। অবশ্য তিনি আমাকেও যে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবেন তা জানি। আর সেই জন্য আমি পাকা ব্যবস্থা করে এখানে এসেছি।

নাদের আলি ও আতিকার বিয়ের আগেই কি আপনি যীনাতকে বিয়ে করতে চান?

হ্যাঁ, তাইতো গোপনে করতে চাই। ওকে আমার ভীষণ পছন্দ। যতদূর বিশ্বাস যীনাত রাজি হবে। তবে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই।

আচ্ছা, বিশ্বাসদের ব্যাপারে আমি যদি আপনাকে সাহায্য করতে চাই?

আশা করি, সাহায্যের দরকার হবে না। হলে আপনি না বললেও সাহায্য চাইতাম।

শুনে খুশি হলাম।

যীনাতকে আসতে দেখে হাবিব ডাক্তার বলল, আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। এবার আসি বলে উঠে দাঁড়াল।

তাসনিমা খাতুন এতক্ষণ আড়াল থেকে তাদের কথা শুনছিলেন। স্বামী কিছু বলার আগে বললেন, দুপুর হয়ে গেছে, খেয়ে যাবেন।

স্ত্রীর কথা শুনে আজরাফ স্যারও বললেন, হ্যাঁ খেয়ে তারপর যাবেন।

মাফ করবেন, আজ খেতে পারব না। হেলথ কমপ্লেক্স থেকে অনেকক্ষণ হয়ে গেল বেরিয়েছি। সাগীর ডাক্তার একা রুগীদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। আজ চলি, অন্য একদিন খাব। আর হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীকেও এসব কথা কাউকে বলতে নিষেধ করে দেবেন। তারপর সালাম বিনিময় করে চলে গেল।

হাবিব ডাক্তার চলে যাওয়ার পর তাসনিমা খাতুন বারান্দায় এসে স্বামীর পাশে বসে বললেন, তোমাদের সব কথা শুনেছি। আমার মনে হয় ডাক্তারের প্রস্তাবে যীনাত রাজি হয়ে যাবে।

আজরাফ হোসেন ভ্রূকুঁচকে বললেন, হঠাৎ তোমার এরকম মনে হল কেন?

হঠাৎ নয়, যেদিন ডাক্তার প্রথম আমাকে দেখতে আসে, সেদিন থেকে যীনাতের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। কি যেন ভাবে, অনেক সময় মুখ ভার করে থাকে। মাঝে মাঝে খুব অন্যমনস্ক থাকে। ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই। ওর এরকম পরিবর্তন দেখে মনে সন্দেহ হতে ব্যাপারটা জানার জন্য সচেতন হলাম। হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম, ডাক্তার এসেছে শুনে ওর

মুখে খুশির আমেজ ফুটে উঠল। ভাবলাম, একটু আগে দেখলাম মুখ ভার করে কি যেন চিন্তা করছে, আর ডাক্তার আসার কথা শুনে খুশি হল কেন? তা হলে কি ডাক্তারকে ওর পছন্দ? আবার ভাবলাম, ওতো নিজেকে অপয়া মনে করে আর বিয়ে করতে চায় না। খুশি হওয়ার অন্য কারণ হয়তো থাকতে পারে অথবা আমার দেখার ভুলও হতে পারে। অন্যদিন ডাক্তার এলে এ রকম কিছু পরিবর্তন হয় কিনা দেখার জন্য সচেতন থাকলাম। তারপর যখনই হাবিব ডাক্তার আসেন তখনই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখে আমার সন্দেহটা দৃঢ় হয়েছে। তাই বললাম, ডাক্তারের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবে।

তোমার কথা যেন আল্লাহ্ কবুল করেন। তবু কিন্তু আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমার মনে আছে কিনা জানি না, প্রায় বছর খানেক আগে আমার সহকারী শিক্ষক জাহাজপোতার আব্দুল বাসেত আমাদের বাড়িতে একদিন এসেছিল। সে সময় যীনাতকে দেখে পছন্দ করে। পরে একদিন স্কুলে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিল। যীনাতের যে আগে দু'বার বিয়ে হয়েছে সে কথা বলার পরও বিয়ে করতে চেয়েছিল। পাত্র হিসাবে আব্দুল বাসেত যে সবদিক থেকে যীনাতের উপযুক্ত তা জানতাম। তাই আমি রাজি হয়ে যীনাতকে অনেক বুঝিয়েছিলাম; কিন্তু ওতো সাফ বলে দিল আর বিয়ে করবে না।

তোমার কথা ঠিক। আব্দুল বাসেত মাস্টারকে হয়তো যীনাতের পছন্দ হয় নি। ওর কথা থাক। আমি আজই ডাক্তারের প্রস্তাব দেয়ার কথা বলে ওর মতামত পরীক্ষা করব।

ঠিক আছে। তাই কর বলে আজরাফ হোসেন বললেন, যোহরের নামাযের সময় হয়ে এল। যাই গোসল করে আসি।

বিকেলে যীনাত যখন ভাবির মাথায় তেল দিয়ে চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল তখন তাসনিমা খাতুন বললেন, হাবিব ডাক্তার মানুষটা কেমন বলতে পারিস?

যীনাত ভাবির চালাকি ধরতে পারল না। বলল, গ্রামের মানুষ তো হাবিব ডাক্তার বলতে পাগল। সবার মুখে মুখে তার সুনাম।

আর তোর মুখে বুঝি বদনাম?

যীনাত হেসে ফেলে বলল, তা কেন? তারমতো ভালো মানুষ জীবনে দেখি নি।

হ্যাঁ, তুই ঠিক কথা বলেছিস, আমারও তাই মনে হয়। আমিও তোর ভাইয়া চিন্তা করেছি, ডাক্তারের সঙ্গে তোর আবার বিয়ে দেব।

কথাটা শুনে যীজাতের হৃদয়ের রক্ত আনন্দে তোলপাড় শুরু করল। হাতের চিরুনী হাতে রয়ে গেল। হাতে যেন এতটুকু শক্তি নেই। স্ট্যাচুর মতো চুপ করে বসে রইল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাসনিমা খাতুন বললেন, কী রে, কিছু বলছিস না কেন? চুলও আঁচড়াচ্ছিস না?

যীনাত সামলে নিয়ে চুলে চিরুনী চালাতে চালাতে বলল, তোমরা চিন্তা করলেও উনি আমার মতো অজপাড়াগাঁয়ের গরিব লোকের অপয়া মেয়েকে বিয়ে করতে যাবেন কেন? হয়তো ঢাকার বড়লোকের মেয়ে ওঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ভাইয়াকে এ ব্যাপারে ডাক্তারকে কিছু বলতে নিষেধ করো।

তার কথা শুনে তাসনিমা খাতুন বুঝতে পারলেন, ডাক্তারের সঙ্গে বিয়েতে রাজি। বললেন, আর ডাক্তার যদি নিজে তোর ভাইয়ার কাছে প্রস্তাব দেয়?

উনি তা দিতেই পারেন না?

ধর, যদি দেন?

ততক্ষণে চুল আঁড়চান হয়ে গেছে। খোঁপা বেঁধে দিয়ে বলল, বললাম তো, উনি এরকম প্রস্তাব দিতেই পারেন না।

আর যদি বলি আমরা কিছু বলার আগেই আজ উনি প্রস্তাব অলরেডী দিয়ে ফেলেছেন।

হৃদয়ের আলোড়ন যীনাত এতক্ষণ সামলাতে পারলেও আর পারল না। পিছন দিক থেকে ভাবি বলে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠে বলল, এই অপয়া হতভাগির কি এত সৌভাগ্য হবে?

আল্লাহ তক্বদীরে রাখলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। ওবেলা সত্যি সত্যি উনি তোকে বিয়ের করার জন্য তোর ভাইয়ার কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন। তাই তো তোর মতামত জানার জন্য এতকিছু বললাম।

চার

আজ নাদের আলির মুখে ঘরে আগুন লেগে যীনাত মারাত্মক আহত হয়েছে শুনে হাবিব ডাক্তার খুব আতঙ্কিত হল। তাড়াতাড়ি সাইকেল চালিয়ে আসার সময় তার জন্য মনে মনে আল্লাহর কাছে দো'য়া করে ভাবল, আজরাফ স্যার কি তাকে বিয়ের প্রস্তাবের কথা জানিয়েছেন?

তখন গ্রীষ্মকাল, গ্রামের প্রায় সবার মাটির দেয়াল হলেও ছাউনি খড়ের। আজকাল অবশ্য অনেকে দালানকোঠা করছে। রোদের তাপে খড়ের চাল এমনই গরম ছিল। আগুন লাগতে বারুদের মতো জ্বলে উঠে। প্রথমে জালালদের রান্নাঘরে কেমন করে জানি আগুন লাগে। তারপর সেই আগুন অন্যান্য ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

হাবিব ডাক্তার পশ্চিমপাড়ায় এসে দেখল, প্রায় বেশির ভাগ ঘর পুড়ে গেছে। মেয়েরা সব কান্নাকাটি করছে। পুরুষরা পোড়া বাঁশ কাঠ সরাচ্ছে। এসব দেখে তার চোখে পানি এসে গেল। দালানকোঠাগুলো ও আজরাফ স্যারের ঘর ঠিক আছে দেখে কিছুটা স্বস্তি' পেল। তাকে লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল।

তাকে দেখে আজরাফ হোসেন সালাম বিনিময় করে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। তারপর যেতে যেতে বললেন, যীনাতের বোধহয় একটা পা ভেঙ্গে গেছে। আমি স্কুলে ছিলাম, আগুনের ধোঁয়া দেখে চলে আসি। তার আগেই যীনাত আহত হয়েছে। এসে শুনলাম, ও আমাদের রান্না করছিল। লোকজনের আগুন আগুন চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসে দেখে দাউ দাউ করে অনেক ঘরের সঙ্গে ওদের ঘরও পুড়ছে। ছুটে নিঁজেদের ঘরে গেল। চাচা ঘুমিয়েছিলেন। আগুনের তাপে যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন বেরোবার পথ ছিল না। লোকজন কেউ তাকে বের করে আনার সাহস পাচ্ছিল না। যীনাত গিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটা বস্তা নিয়ে পুকুরে গলা পর্যন্ত নামে তারপর বস্তাটা ভিজিয়ে গায়ে জড়িয়ে জ্বলন্ত ঘরে ঢুকে বস্তাটা চাচার গায়ে জড়িয়ে বের করে নিয়ে আসে। চাচার ও যীনাতের হাত-পা কিছুটা পুড়ে গেলেও মারাত্মক কিছু হয় নি। কিন্তু বেরিয়ে আসার সাথে সাথে ঘরের একটা আড়া তার ডান পায়ের উপর পড়ে। মেয়েরা ধরাধরি করে তাকে আমার ঘরে নিয়ে আসে।

ততক্ষণে তারা যে ঘরে হাশেম আলি ও যীনাত ছিল, সেখানে এসে গেল। হাবিব ডাক্তার তাদের দুজনের পোড়া জায়গাগুলো পরীক্ষা করে মলম লাগিয়ে দিল। তারপর যীনাতের পা পরীক্ষা করে প্লাস্টার করে দিয়ে সঙ্গে আনা কিছু ওষুধ খাওয়ার জন্য দিল এবং আরো কিছু ওষুধ লিখে দিয়ে বলল, অন্য যারা আগুনে পুড়ে জখম হয়েছে, তাদের কাছে যাচ্ছি।

কয়েকদিনের মধ্যে বাপ-মেয়ের পোড়া ঘা ভালো হয়ে গেলেও যীনাতের প্লাস্টার একমাস পরে খোলা হল। কিন্তু পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারছে না দেখে হাবিব ডাক্তার আবার প্লাস্টার করে দিল।

হাবিব ডাক্তার একদিন তাসনিমা খাতুনকে দেখতে এসে ফেরার সময় আজরাফ হোসেনকে জিজ্ঞেস করল, যীনাতকে আমার প্রস্তাবের কথা কী জানিয়েছেন?

আজরাফ হোসেন বললেন, হ্যাঁ, জানিয়েছি। সে রাজি আছে।

হাবিব ডাক্তার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বেশ কিছু টাকার একটা বান্ডিল তার হাতে দিয়ে বলল, ওদের দু'কামরা পাকা ঘর করে দেবেন। পরে আরো দেব।

আজরাফ হোসেনের খুব আপত্তি সত্ত্বেও প্রথম থেকে কোনো টাকা পয়সা না নিয়ে হাবিব ডাক্তার চাচার চিকিৎসা করছে। বাপ-মেয়ে আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরও যে চিকিৎসা করছে, সেজন্যেও কোনো টাকা পয়সা নেয় নি। আজ আবার তাদের পাকাঘর করে দেয়ার টাকা দিতে দেখে আজরাফ হোসেন যতটা না অবাক হলেন, তারচেয়ে বেশি অপমান বোধ করলেন। বললেন, এটা আপনার ঠিক হচ্ছে না। আমিই ভেবেছি, এবার চাচাকে পাকাঘর করে দেব। না-না, এ টাকা আমি নিতে পারব না বলে ফেরৎ দিতে গেলেন।

হাবিব ডাক্তার তার টাকাসহ হাতটা দু'হাতে ধরে বলল, মনে হচ্ছে, আপনি খুব অপমান বোধ করছেন। সেজন্য মাফ চাইছি। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনাকে অপমান করার ধৃষ্টতা আমার যেন কোনো দিন না হয়। আসলে হাশেম আলি চাচার মতো ভালো মানুষ আমি আর কাউকে দেখি নি। যীনাত যদি আমার প্রস্তাবে রাজি নাও হত, তবু তার ঘর করে দিতাম। ওঁকে আমি বাবার মতো শ্রদ্ধা করি। তাই ছেলে হয়ে বাবার জন্য কিছু করতে পারলে মনে শান্তি পাব, আর দুস্থকে সাহায্য করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দঃ) খুশি হবেন ভেবে এটা করে দিতে চাচ্ছি। তা ছাড়া ভেবেছি, বিয়ের পর আমি ওদের সংসারের সব দায়-দায়িত্ব বহন করব।

তার কথা শুনে আজরাফ হোসেন আর আপত্তি করতে পারলেন না। টাকাসহ হাতটা টেনে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন, বিয়ের আগেই তা হলে ঘরের কাজ শেষ করতে চান?

হাবিব ডাক্তার মৃদু হেসে বলল, সেটা যখন বুঝতেই পেরেছেন তখন আর জিজ্ঞেস করছেন কেন? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘরের কাজ কমপ্লিট করুন। তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেল।

আজরাফ হোসেন হাবিব ডাক্তারকে যত জানছেন তত অবাক হচ্ছেন। কিছুক্ষণ তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে স্ত্রীকে ডেকে কথাটা জানালেন।

তাসনিমা খাতুনও হাবিব ডাক্তারকে যত জানছেন, তত অবাক হচ্ছেন। বললেন, সত্যি, ওঁর মতো মানুষ হয় না। যীনাতের ভাগ্য খুব ভালো, এরকম একজন মানুষকে স্বামী হিসাবে পাবে।

হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক। এজন্যেই বোধহয় আল্লাহ ওকে দু'দুবার বিয়ের রাতেই বিধবা করেছেন। যারা এতদিন ওকে অপয়া বলত, বিয়ের পর তারা ওর ভাগ্য দেখে হিংসা করবে।

তুমিও ঠিক কথা বলেছ। দো'য়া করি, আল্লাহ ওদের জোড়া তাড়াতাড়ি কবুল করুক।

চাচার কাছে যীনাত আছে তুমি চাচাকে এখানে আসতে বল। এখনই সব কিছু জানাব। মনে হয় আপত্তি করবেন না, বরং খুশিই হবেন।

আমারও তাই মনে হয় বলে তাসনিমা খাতুন ভিতরে চলে গেলেন।

একটু পরে হাশেম আলি এসে বললেন, বৌমা বলল, তুমি নাকি ডেকেছ?

আজরাফ হোসেন বললেন, বসুন চাচা, জরুরী আলাপ করব।

হাশেম আলি তার সামনের চেয়ারে বসলেন।

টাকা দেয়ার পর হাবিব ডাক্তার যা কিছু বলেছে, আজরাফ হোসেন সে সব বলে বললেন, আমরা বিয়ের ব্যাপারে যীনাতের মতামত নিয়েছি। সে রাজি আছে।

প্রথম যেদিন হাবিব ডাক্তার হাশেম আলিকে দেখতে আসে, সেদিন তাকে দেখে ও কথাবার্তা শুনে খুব ভালো লেগেছিল। তারপর তার চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে চলাফেরা করতে পারছে, সেজন্য আগের থেকে এমনি কৃতজ্ঞ ছিল। এখন টাকা-পয়সা না নিয়ে চিকিৎসা করছে, পাকা ঘর করার জন্য টাকা দিয়েছে ও বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে শুনে আরো বেশি কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন। সেই সাথে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো আনন্দিত হলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভিজে গলায় বললেন, তুমিই যখন আমাদের সব কিছু করছ তখন আমি কি আর বলব বাবা? ওর চিন্তা আমার বুকে পাথরের মতো এতদিন চেপে ছিল। আজ তা দূর করে আল্লাহ আমাকে মুক্ত করলেন। সেইজন্য তাঁর পাক দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া জানাচ্ছি।

কিছুদিন পর যেদিন হাবিব ডাক্তার যীনাতের প্লাস্টার খুলে দিল, সেদিন যীনাত আপ্যায়ন করাবার সময় বলল, দু'একটা প্রশ্ন করব, কিছু মনে করবেন না বলুন?

মনে করার কি আছে, আপনি নিশ্চিন্তে বলুন।

আমার সম্পর্কে সবকিছু জেনেও এই অজপাড়াগাঁয়ের মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন কেন? আপনি তো ঢাকার ছেলে, সেখানে ধনী ঘরের শিক্ষিত মেয়েরতো অভাব নেই?

আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব, তবে তার আগে আপনার মুখের নেকাব সরাতে হবে। এতদিন শুধু আপনার দু'টো চোখ দেখে এসেছি।

বেগানা মেয়ের মুখ ইচ্ছা করে দেখা ইসলামে নিষেধ তাতো জানেন?

হ্যাঁ জানি।

তা হলে এরকম কথা বলছেন কেন?

বিয়ের আগে ইসলামে পাত্র-পাত্রীকে একে-অপরকে দেখার অনুমতি যে আছে, তা বোধহয় জানেন না?

না, জানা ছিল না।

এবার তা হলে মুখটা খুলুন?

যীনাত কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে মুখ থেকে ওড়না সরিয়ে দৃষ্টি নিচের দিকে করে রইল।

সুবহান আল্লাহ বলে হাবিব ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হল, কোনো পরীকন্যা দেখছে। আরো মনে হল, মুশতাক বিশ্বাসের মেয়ে আতিকার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে লজ্জামিশ্রিত কণ্ঠে যীনাত বলল, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

আমার প্রস্তাবে রাজি আছেন কিনা জানার পর উত্তর দেব।

যার কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন তার কাছ থেকে জেনে নেবেন।

তাতো নেবই। তবু এখন আপনার কাছে জানতে চাই।

পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা এখনও সরাসরি এরকম প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো এ্যাডভান্স হয় নি।

তা স্বীকার করছি। আপনাকে তাদের থেকে ব্যতিক্রম দেখে প্রশ্নটা করেছি। উত্তর দেয়াটা কিন্তু নির্লজ্জতা নয়, বরং ভালো।

রাজি বলে যীনাত লজ্জারাঙা হয়ে মুখ নিচু করে নিল।

আলহামদুলিল্লাহ বলে হাবিব ডাক্তার বলল, প্লীজ, মুখ তুলে আমার দিকে তাকান।

যীনাত কয়েক সেকেন্ড একইভাবে থেকে মুখ তুলে তার দিকে তাকাল।

হাবিব ডাক্তার দেখল, টানাটানা মায়াবী চোখ দুটো থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে। তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, তোমার মতো মেয়েকে আল্লাহ আমার তক্বদীরে জোড়া করেছেন। তাই শহরের কোনো মেয়েকেই আমার পছন্দ হয় নি। সেইজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

তার কথা শুনে যীনাত আরো বেশি লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে নিল। তারপর চোখ মুছে কাঁপা গলায় বলল, ঐ একই কারণে হয়তো দু'দু'টো স্বামীকে আল্লাহ বিয়ের রাতেই দুনিয়া থেকে তুলে নিলেন। তবু সেই ঘটনাগুলোর কথা ভেবে খুব ভয় পাচ্ছি।

তক্বদীরের উপর কারো হাত নেই। আল্লাহর উপর ভরসা কর। আর প্রত্যেক মুমীন মুসলমান নর-নারীর তাই করা ও উচিত। ইনশাআল্লাহ বিয়ে করে তোমার ভয় দূর করে দেব। আজ অনেক বড় দুশ্চিন্তা থেকে আল্লাহ আমাকে রেহাই দিলেন। সেজন্য আর একবার তাঁর শোকরিয়া আদায় করছি। তারপর বলল, আমি তোমাকে তুমি করে বলছি। এখন থেকে তুমিও আমাকে তুমি করে বলবে।

মাফ করবেন, এখন থেকে বলতে পারব না, তবে বিয়ের পর—বলে লজ্জায় জিব কেটে চুপ করে গেল।

হাবিব ডাক্তার মৃদু হেসে বলল, ঠিক আছে, তাই বলো। এখন একটা কথার উত্তর দাও তো, এতদিন নিজেকে অপয়া ভেবে বিয়ে করতে রাজি হও নি, এখন হলে কেন? তোমার আব্বাকে ও তোমাকে টাকা পয়সা না নিয়ে চিকিৎসা করে ভালো করেছি, সেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য কী রাজি হয়েছ?

যীনাত কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে কঠিন গলায় বলল, আপনার ধারণা ভুল। আপনি যে বিনা টাকা পয়সায় আমাদের চিকিৎসা করছেন, তা জানতাম না।

তা হলে আসল কারণটা বল।

আপনি যে কারণে আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন, আমিও সেই কারণেই রাজি হয়েছি।

আমার ব্যাপারটা তুমি জানলে কেমন করে?

সে কথা বলতে পারব না। এবার নিশ্চয় আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন?

উত্তর তো তুমি জান, তবু বলতে বলছ কেন?

আমার ধারণাটা সত্য কিনা যাচাই করার জন্য।

যাচাই করা লাগবে না। তোমার ধারণাটাই সত্য।

এমন সময় হাশেম আলিকে আসতে দেখে হাবিব ডাক্তার সালাম বিনিময় করে বলল, কেমন আছেন?

আল্লাহর রহমতে ভালো আছি বাবা, তারপর মেয়ের পায়ে প্লাস্টার নেই দেখে বললেন, কী রে মা, এখন আর চলাফেরা করতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?

যীনাত আব্বাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তাকে নিজের চেয়ারে বসিয়ে বলল, না আব্বা, কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। তারপর একটা তাল পাখা এনে বাতাস দিতে লাগল।

ডাক্তারকে নাস্তা পানি কিছু দিয়েছিস?

চা-বিস্কুট দিয়েছি।

তা ছাড়া কিই বা দিবি মা? ঘরে তো....

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে হাবিব ডাক্তার বলল, এবার আসি চাচা। অনেকক্ষণ এসেছি। তারপর সালাম বিনিময় করে চলে গেল।

আজ তাসনিমা খাতুন চাঁদের মতো একটা ফুটফুটে ছেলে প্রসব করেছেন। আজরাফ হোসেনের ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। স্ত্রীর প্রসব ব্যথা উঠার কথা জেনে আজরাফ হোসেন নিজে কার্পাসডাঙ্গায় গিয়ে হাবিব ডাক্তারকে খবরটা দেন।

হাবিব ডাক্তার একজন নার্স সঙ্গে নিয়ে আসে এবং ঐ নার্সের তত্ত্বাবধানে প্রসব করায়।

প্রসবের পর যা কিছু করণীয় করার পর বিদায় নেয়ার সময় আজরাফ হোসেন নার্সকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে খুশি করলেন। হাবিব ডাক্তারকে খুশি করতে ইচ্ছা করলেও সে অপমানবোধ করবে ভেবে কিছু দিলেন না।

সাতদিনে আজরাফ হোসেন দু'টো খাসি জবেহ্ করে ছেলের নাম রাখলেন আবরার হোসেন। যার অর্থ ন্যায়বান সুন্দর। নামটা হাবিব ডাক্তার ঠিক করে দেয়। ঐদিন পাড়ায় গরিব-ধনী সবাইকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ালেন। কার্পাসডাঙ্গার হেলথ কমপ্লেক্সের দু'জন ডাক্তার ও দু'জন নার্সকেও দাওয়াত করেছিলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর সাগীর ডাক্তার ও নার্সদের হাবিব ডাক্তার বলল, আপনারা যান। আমার তো সাইকেল আছে, কিছুক্ষণ পর আসছি।

তারা চলে যাওয়ার পর আজরাফ হোসেনকে বলল, আপনি কী আমার প্রস্তাবটা নিয়ে যীনাতের আব্বার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন?

আজরাফ হোসেন বললেন, হ্যাঁ করেছি। উনি রাজি আছেন।

তা হলে এই আনন্দের দিনে আমি বিয়ের কাজটা সেরে ফেলতে চাই।

তার কথা শুনে আজরাফ হোসেন আনন্দিত হলেও অবাক হয়ে থতমত খেয়ে বললেন, আজ কী করে সম্ভব?

আল্লাহর মর্জি থাকলে সবকিছু সম্ভব। শুনুন, আমি এখন চলে যাচ্ছি, আপনাকে যেভাবে যা কিছু করতে বলেছিলাম, যীনাত ও তার আব্বার সঙ্গে আলাপ করে সে সব ব্যবস্থা করে রাখবেন। আমি রাত দশটার দিকে আসব। তারপর আজরাফ হোসেনকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সাইকেলে চেপে বসল।

আজরাফ হোসেন কিছুক্ষণ হাঁ করে তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ঘরে এসে স্ত্রীকে হাবিব ডাক্তারের কথা জানিয়ে বললেন, এখন কী করি বলতো?

তাসনিমা খাতুন বললেন, কী আবার করবে? উনি যেভাবে যা করতে বললেন, করবে। আমি তো অসুবিধে কিছু দেখছি না।

পাঁচ

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান খুব সৎ ও ধার্মিক। ত বাড়ি কুতুবপুর গ্রামের কাঁটাবাগান পাড়ায়। আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো হলেও সংসারে অভাব অনটন নেই। মুশতাক বিশ্বাস টাকার জোরে কয়েকব চেয়ারম্যান হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সৎ ও ধার্মিকতার কারণে অর্থবল থাকলেও আজিজুর রহমানকে প্রতিবারেই জনগণ ভোট দিয়ে জিতিয়েছে। আ পনের বছর তিনি চেয়ারম্যানি করছেন। তার সুনাম সারা ইউনিয়নে। সরকারে কাছ থেকে যা কিছু সাহায্য আসে, তা জনগণের কল্যাণে ব্যয় করেন। তা থে তিনি এক কানাকড়িও যে আত্মসাৎ করেন না, সে কথা জনগণ জানে। ত সকলের কাছ থেকে শ্রেণীমতো ভক্তিশ্রদ্ধা পান।

মুশতাক বিশ্বাস অল্প শিক্ষিত হলেও খুব চালাক চতুর লোক। তিনি গ্রামে মাতব্বর। লোক হিসাবে যে খুব খারাপ তা নয়, ধনীরা সাধারণত কৃপণ হয় গরিবদের সাহায্যের নামে তাদের জমি-জায়গা আত্মসাৎ করে। কিন্তু তিনি (রকম লোক নন। গরিবদের আপদে বিপদে সাহায্য করেন। নিয়মিত নামায রো করেন। হজ্বও করেছেন। স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসার উন্নতির জন্য টা পয়সা দান করেন। তবু যে কেন তার সুনাম জনগণ না করে চেয়ারম্যান আজিজু রহমানের সুনাম করে, তা তিনি বুঝতে পারেন না। এক ধরনের মানুষ থাকে তারা বড়লোকী জাহির করতে চায়, অহঙ্কারী হয়, তোষামোদ ভালবাসে, অপরে মুখে সুনাম শুনতে পছন্দ করে, মুশতাক বিশ্বাস ঐ ধরনের লোক। তাই নিজে লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে কয়েকবার চেয়ারম্যান পদে দাঁড়িয়েছিলেন। কি হতে না পেরে আজিজুর রহমানের উপর ক্ষুব্ধ। কয়েকজন গুপ্তচর লাগিয়েছে তার দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করার জন্য, কিন্তু তাতেও সফল হতে পারেন নি। দু রাজার মধ্যে যুদ্ধ হলে যিনি হেরে যান, তিনি যেমন রাজ্য হারাবার ভয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিজেতার বশ্যতা স্বীকার করে নেন, তেমনি আজিজুর রহমানের কা বারবার হেরে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনের খায়েশ চেপে রেখেছেন। তবে একদ হাল ছাড়েন নি। সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। ইদানিং হাবিব ডাক্তারের সুনা লোকের মুখে মুখে জেনে পুরোনো স্বভাবটা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই ত পিছনেও লোক লাগিয়েছেন দোষত্রুটি খুঁজে বের করার জন্য।

গিয়াস খুব চতুর লোক। জমির ফসলে সারা বছরের খোরাকী হয়ে যায় বাজার হাট করার জন্য মুশতাক বিশ্বাসের চামচাগিরি করে যা পায় তাতে চ

যায়। এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে ছোট সংসার। সারাদিন গ্রামে ঘুরে ফিরে লোকের ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়ায়, রাতে সে সব মুশতাক বিশ্বাসের কাছে তিলকে তাল করে বলে। মুশতাক বিশ্বাস তার উপরেই ভার দিয়েছেন হাবিব ডাক্তারের দোষ খুঁজে বের করার জন্য। বেশ কিছুদিন থেকে হাবিব ডাক্তারকে পশ্চিমপাড়ায় ঘন ঘন যেতে দেখে গিয়াস তাকে ফলো করে জানতে পারল, হেড মাস্টার আজরাফ হোসেনের সঙ্গে তার বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আরো জানতে পারল, পঙ্গু হাশেম আলিকে ফ্রি চিকিৎসা করে ভালো করেছে এবং তার দু'বার বিধবা হওয়া মেয়ে যীনাতের সঙ্গে নিরিবিলিতে আলাপ করে। ইদানিং মাঝে মধ্যে বেশ রাতে তাকে পশ্চিমপাড়া থেকে ফিরতেও দেখেছে। তার সন্দেহ হল, তা হলে কি যীনাতের সঙ্গে ডাক্তারের কোনো অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে? কথাটাতো মাতব্বর সাহেবকে জানান দরকার?

প্রতিদিন বৈঠক খানায় এশার নামাযের পর ঘণ্টা খানেক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গ্রামের লোকজন মুশতাক মাতব্ববের কাছে আসে। আজও এসেছিল। সবাই চলে যাওয়ার পর গিয়াসকে বসে থাকতে দেখে বললেন, কি গিয়াস, তুমি তো দেখছি কোনো কাজের লোক নও। প্রায় সাত আট মাস হয়ে গেল, হাবিব ডাক্তারের কোনো খোঁজ খবর দিতে পারলে না।

গিয়াস বলল, মাতব্বর সাহেব, এসব কাজ কি আর তাড়াতাড়ি হয়। এতদিনে যা জেনেছি, বলছি। তারপর হাবিব ডাক্তারের সম্পর্কে যা জেনেছে বলল।

মুশতাক বিশ্বাসের মুখে ক্রুর হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। বললেন, খুব সাবধানে হাশেম আলির বাড়ির দিকে লক্ষ্য রাখবে। হাবিব ডাক্তার তার মেয়ের সঙ্গে অসামাজিক কাজে জড়িত আছে কিনা জানবে। বেটা ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখে নি। ডাক্তার হয়ে হুজুরগিরী ছাড়িয়ে দেব।

গিয়াস বলল, মাতব্বর সাহেব, আর একটা খবর আছে, নাদের আলি দু'কামরা পাকা দালান বানাচ্ছে।

কি বললে গিয়াস, নাদের আলি দালান বাড়ি বানাচ্ছে? যে নাকি কামলাগিরী করে পেট চালায়, সে আবার দালান বাড়ি বানায় কি করে?

আমিও তাই বলি। একদিন নাদের আলিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এত টাকা কোথায় পেলে, দালান বাড়ি করছ?

বলল, কোথায় আবার পাব? আল্লাহ দিয়েছে!

হুঁ বলে মুশতাক বিশ্বাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, নাদের আলির টাকার উৎস খুঁজে বের করবে।

সে কথা বলা লাগবে না মাতব্বর সাহেব। আপনি বলার আগেই কাজে নেমে পড়েছি। তেমন কোনো সন্ধান পাই নি। তবে মাঝে মধ্যে নাদের আলিকে

কার্পাসডাঙ্গা হেলথ কমপ্লেক্সে যেতে দেখেছি। আর হাবিব ডাক্তারকেও নাদের আলির সঙ্গে মাঝে মধ্যে পথে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলাপ করতেও দেখেছি।

তোমার কি মনে হয়, হাবিব ডাক্তার দালান বাড়ি করার জন্য নাদের আলিকে টাকা দিচ্ছে?

ঠিক তা মনে হয় নি। তবে একটু সন্দেহ হয় আর কি?

এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি আমার চামচাগিরী কর? হাবিব ডাক্তারের কি এমন স্বার্থ যে, দালান বাড়ি করার জন্য নাদের আলিকে টাকা দেবে? শোন, নাদের আলির টাকার উৎস খোঁজার সাথে সাথে হাবিব ডাক্তারের সম্পূর্ণ পরিচয় জানার চেষ্টা করবে।

ঠিক আছে, তাই করব?

মুশতাক বিশ্বাস বুক পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, এবার যাও।

গিয়াস দোঁতা হাসি দিয়ে বলল, আসি মাতব্বর সাহেব। তারপর সালাম দিয়ে চলে গেল।

মুশতাক বিশ্বাস তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, নাদের আলির টাকার উৎস যেমন করে হোক জানতে হবে। গিয়াস হাবিব ডাক্তারকে সন্দেহ করছে। কিন্তু সেই বা এত টাকা পাবে কোথায়? বেতন আর কত টাকা পায়? বড় জোর চার-পাঁচ হাজারের মতো? হঠাৎ মনে পড়ল, কয়েকমাস আগে হাবিব ডাক্তারের সঙ্গে মেয়ের আলাপ করার কথা। ভিতর বাড়িতে গিয়ে মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, হাবিব ডাক্তার লোকটা কেমন বলতে পারিস?

আব্বাকে হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করতে শুনে আতিকা অবাক হল। সেই সাথে একটু ঘাবড়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, কেমন লোক তাতো তুমিও জান। তোমার যখন কঠিন অসুখ হয়েছিল তখন তিনিই চিকিৎসা করে ভালো করেছিলেন।

আমি তো জানি সে ভালো ডাক্তার। লোক হিসাবে কেমন জিজ্ঞেস করেছি।

লোক হিসাবেও খুব ভালো। তার মতো ভালো মানুষ আর দেখি নি।

তোর সঙ্গে দেখা হয়?

দেখা হয়, তবে ইদানিং দেখা হয় নি।

কিছুদিন আগে দেখলাম, তুই রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলছিলি? তার পরিচয় জানিস না কি?

এই কথা শুনে আতিকা আরো ঘাবড়ে গেল। ভাবল, সেদিন আমাদের কথাবার্তা আব্বা শুনে নি তো? সামলে নিয়ে বলল, না আব্বা জানি না। তবে ভাইয়া জানে; সে হেড মাস্টার আজরাফ স্যারের কাছে শুনেছে।

ঠিক আছে তুই যা। তারপর মুশতাক বিশ্বাস চিন্তা করলেন, ছেলের কাছে জানার আগে আজরাফ মাস্টারের কাছেই শোনা দরকার।

সেখানে মুশতাক বিশ্বাসের স্ত্রী শাফিয়া বানু ছিলেন। মেয়ে চলে যাওয়ার পর বললেন, তোমার অসুখের সময় আমি হাবিব ডাক্তারকে দেখেছি, আতিকার কথাই ঠিক। আমার কাছেও খুব ভালো মানুষ বলে মনে হয়েছে।

মুশতাক বিশ্বাস স্ত্রীকে আদর করে শুধু বানু বলে ডাকেন। তার কথা শুনে বললেন, বলত বানু, হাবিব ডাক্তার কি আমার থেকে ভালো মানুষ?

শাফিয়া বানু এরকম প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। থতমত খেয়ে বললেন, এ আবার কি রকম কথা বলছ? "কি সে কী, আর পান্তাভাতে ঘি।" জান না, মেয়েদের কাছে স্বামী সবার থেকে বড়। তোমার মতো স্বামী পেয়ে আমি ধন্য।

মুশতাক বিশ্বাস তৃপ্তির হাসি হেসে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার মতো স্ত্রী পেয়ে আমিও ধন্য।

শাফিয়া বানু বললেন, ছাড় ছাড়, কেউ এসে পড়বে। বুড়ো হলে তবু আগের মতো রয়ে গেলে।

মুশতাক বিশ্বাস হাসতে হাসতে বললেন, আরে বানু, মানুষ বুড়ো হলেও মন তো আর হয় না। মন চিরকাল কচিই থাকে।

থাক তুমি তোমার কচি মন নিয়ে। আমি চললাম সবাইকে খেতে দিতে হবে বলে শাফিয়া বানু চলে গেলেন।

পরের দিন সকালে রসু নামে আর একজন চামচাকে সঙ্গে নিয়ে মুশতাক বিশ্বাস পশ্চিমপাড়ায় আজরাফ মাস্টারের বাড়িতে গেলেন।

আজ কিসের জন্য যেন স্কুল বন্ধ। আজরাফ হোসেন বাড়িতে ছিলেন। তাদেরকে দেখে এগিয়ে এসে সালাম বিনিময় করে বললেন, কি সৌভাগ্য, মাতব্বর সাহেব হঠাৎ গরিবের বাড়ি? তারপর বৈঠকখানায় নিয়ে এসে বসতে বললেন।

বসার পর মুশতাক বিশ্বাস বললেন, শুনলাম এত বছর পর তোমার ছেলে হয়েছে?

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছা। দো'য়া করবেন, আল্লাহ যেন ওকে হায়াতে তৈয়েবা দান করেন।

তাতো করবই। তা তোমার হাশেম আলি চাচা কেমন আছে?

উনি তো এখন প্রায় সুস্থ। সংসারের কাজকর্ম করতে পারেন। তবে ডাক্তার ভারি কোনো কাজ করতে ও বেশি হাঁটাহাঁটি করতে নিষেধ করেছেন।

হাবিব ডাক্তারের চিকিৎসায় নাকি সুস্থ হয়েছে?

হ্যাঁ, এখনো চিকিৎসা চলছে। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষ হিসাবে হাবিব ডাক্তারের মতো ছেলে হয় না।

এমন সময় যীনাত তিন কাপ চা ও বিস্কুট একটা ট্রেতে করে নিয়ে এসে সালাম দিয়ে বলল, মাতব্বর চাচা কেমন আছেন?

মুশতাক বিশ্বাস তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।

যীনাত কিছু বলার আগে আজরাফ হোসেন বললেন, চিনতে পারলেন না? ওতো হাশেম আলি চাচার মেয়ে যীনাত।

কি করে চিনব বল, ওড়না দিয়ে যেভাবে মুখ ঢেকে রেখেছে।

একথা শুনে যীনাত ট্রে রেখে চলে গেল।

আজরাফ হোসেন বললেন, ওতো কখনও মুখ খোলা রেখে কারো সামনে আসে না। হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় থেকে ঐভাবে মুখ ঢেকে স্কুলে যেত। আমি তো ওর চাচাত বড় ভাই। আমার সামনেও ঐভাবে মুখ ঢেকে আসে।

তাই নাকি? এতটা কিন্তু ভালো না। বড় ভাই বা বাপ-চাচার বয়সী লোকেদের সামনে মুখ খোলা রাখলে দোষ কি?

আমি ওকে একদিন সে কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, শরীয়তে যে চোদ্দজনকে বিয়ে করা হারাম বলা হয়েছে, তাদেরকে ছাড়া সবাইকেই পর্দা করতে হবে। যীনাত তো তবু পর্দা করে আমার সামনে আসে, চাচি আম্মাতো পর্দা করেও আসতেন না।

আজকাল তো শরীয়তের আইন কেউই মেনে চলে না। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে লেখাপড়া করছে? চাকরি-বাকরি করছে।

কেউ মেনে না চললেও যে মেনে চলে, তাকে কিছু বলা উচিত নয় বরং তাকে শ্রেণীমতো ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত।

এই প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য মুশতাক বিশ্বাস বললেন, ওকে আগে একবার দেখেছিলাম, এখনতো দেখছি বেশ মোটা-সোটা হয়েছে। তাই চিনতে পারি নি। তারপর হাশেম আলির বাস্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওখানে পাকা দালান দেখেছি, ওটা কার?

হাশেম আলি চাচার।

মুশতাক বিশ্বাস অবাক হয়ে বললেন, সে তো সব জমি-জায়গা বিক্রি করে দিয়েছে, পাকা দালান করল কি করে?

হাবিব ডাক্তার যীনাতকে বিয়ের আগে পাকা বাড়ি করে দিয়েছে। সে কথা কাউকে জানাতে নিষেধ করে দিয়েছিল। তাই আজরাফ হোসেন বললেন, আমিই করে দিয়েছি। বন্যায় মাটির বাড়ি ধ্বসে গিয়েছিল। ভাবলাম, মাটির বাড়ি করলে আবার যদি বন্যায় ধ্বসে যায়, তাই পাকাই করে দিলাম।

আজরাফ হোসেন যে খুব দিল-দরিয়া লোক, তা মুশতাক বিশ্বাস জানেন। বললেন, ভালই করেছেন, হাজার হোক চাচা তো। তা হাবিব ডাক্তার এদিকে আসে?

রুগী দেখতে এলে আসেন। তা ছাড়া আগে আমার স্ত্রীর পেটে যখন সন্তান আসে তখন থেকে মাসে একবার দেখতে আসতেন। চাচার অসুখের কথা জেনে তার চিকিৎসা করার জন্য আসতেন। এখনও আমার সন্তানকে ও চাচাকে দেখতে আসেন।

আচ্ছা মাস্টার, গ্রামের সবার মতো তুমিও তার প্রশংসা করলে; কিন্তু তার পরিচয় জেনেছ?

আপনি বোধহয় জানেন না, মানুষের ব্যবহারই তার বংশের পরিচয়।

তা আর জানব না? আমি বলছি কার ছেলে? কোথায় বাড়ি, এসব জান কিনা?

আজরাফ হোসেন জানেন, মাতব্বর কোনো মতলব ছাড়া স্বশরীরে কোথাও হাজির হন না। তাই তাকে একজন চামচাসহ আসতে দেখে যা অনুমান করেছিলেন, এতক্ষণ আলাপের মাধ্যমে তা দৃঢ় হল। বললেন, জানব না কেন? সুপ্রিমকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার খলিলুর রহমানের চার ছেলের মধ্যে হাবিব ডাক্তার ছোট। ওর বাবার ঢাকায় কয়েকটা বাড়ি আছে। বড় ভাই পুলিশ বিভাগের ডি.জি.। মেজ ও সেজ ব্যবসা করে।

মুশতাক বিশ্বাস অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে আজরাফ হোসেনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, হাবিব ডাক্তার বুঝি তোমাকে তাই বলেছে?

হ্যাঁ, আপনার কী বিশ্বাস হচ্ছে না?

বিশ্বাস হওয়া কি সম্ভব? ও যে তোমার কাছে গুল ছেড়েছে, এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? যদি অত নামি-দামি বড়লোকের ছেলে হবে, তা হলে শহরের আরাম-আয়েশ ছেড়ে এই অজপাড়াগাঁয়ে ডাক্তারী করতে আসবে কেন?

আমি তাকে যতটুকু জেনেছি, তাতে মনে হয়েছে, তিনি মহৎ গুণের অধিকারী। তাই অজপাড়াগাঁয়ের গরিব মানুষের সেবা করতে এসেছেন।

কথাটা মুশতাক বিশ্বাস অস্বীকার করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কি জানি, হয়তো তোমার কথা ঠিক। যাক, এবার আসি তা হলে বলে মুশতাক বিশ্বাস চামচাকে বললেন, চল রে রসু, অনেক বেলা হয়ে গেল।

ফেরার পথে চিন্তা করলেন, যীনাত তার মায়ের মতো পর্দানশীল মেয়ে। সে কখনও ডাক্তারের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না। আর ডাক্তারও সে ধরণের ছেলে নয়। হাশেম আলির চিকিৎসা করতে গেলে সে সময় হয়তো দু'জনের

মধ্যে কথাবার্তা হয়। আর সেটা দেখেই গিয়াস তাদের সম্পর্কে ঐরকম কথা বলেছে। সে রকম কিছু হলে আজরাফ মাস্টার নিশ্চয় জানতে পারত। জানার পর ডাক্তারের সঙ্গে সম্পর্কও রাখত না। আরো চিন্তা করলেন, আতিকা বলল, পারভেজ ডাক্তারের সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। তাকেও জিজ্ঞেস করতে হবে। ডাক্তারদের পদবী কী জানতে হবে। সবকিছু মিলে গেলে আতিকার সঙ্গে বিয়ে দিলে ভালোই হবে।

বাড়িতে এসে এক সময় ছেলেকে বললেন, হাবিব ডাক্তারের সুনাম গ্রামের লোকের মুখে মুখে, সে কি সত্যিই ভালো?

পারভেজ জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখে আসছে আব্বা তোষামোদী খুব পছন্দ করেন। কারো সুনাম সহ্য করতে পারেন না। সব সময় পরের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ান। সেজন্য দু'চারজন চামচা ধরনের লোক নিযুক্ত করেছেন। কারো দোষ-ত্রুটির খবর পেলে বিচার করেন। নিজের সুনাম শুনতে খুব ভালবাসেন। সেজন্য ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রতিবছর যাকাত দেন। মসজিদ, মাদ্রাসা ও স্কুলে অনেক টাকা দান করেন। গ্রামের গরিবদেরও কিছু কিছু দান করেন। পারভেজ আব্বার এসব কাজে সন্তুষ্ট না থাকলেও কখনো কিছু বলে নি। হজ্ব করে আসার পর পারভেজ ভেবেছিল, আব্বা এবার হয়তো ঐসব খেয়াল ত্যাগ করে আল্লা-বিল্লাহ্ করে কাটাবেন। কিন্তু আগের মতই সবকিছু করতে দেখে একদিন বলল, আপনি মাতব্বরী ছেড়ে দেন। মাতব্বরী করতে গিয়ে যে সময় নষ্ট করেন, সে সময় আল্লাহর জিকির আজকার করুন।

মুশতাক বিশ্বাস ছেলেকে নিজের মতো করে মানুষ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সফল হন নি। এক ছেলে বলে তেমন শাসনও করতে পারেন নি। তবে নিজে অল্প শিক্ষিত হলেও ছেলে বি.এ. পাশ করছে তাতেই গর্বিত। ছেলের কথা গর্বের সঙ্গে গ্রামের লোকজনের কাছে বলে বেড়ান। ছেলে যে তার প্রতি এইসব কাজের জন্য অসন্তুষ্ট তা বোঝেন। তাই তিনিও ছেলের প্রতি অসন্তুষ্ট। এখন তার কথা শুনে বললেন, এসব কেন করি, এতদিনে তোমার বোঝা উচিত ছিল। বুঝলে একথা বলতে না। মনে করেছিলাম, আমার বয়স হয়েছে, এবার তোমাকে মাতব্বরীটা দেব; কিন্তু তুমি তো আবার এসব পছন্দ কর না। যাক, এসব ব্যাপার নিয়ে আর কোনো কথা বলবে না।

এরপর থেকে পারভেজ আব্বাকে কিছু বলে নি। আজ হাবিব ডাক্তার ভালো কিনা জিজ্ঞেস করতে ভাবল, তার সুনাম আব্বা সহ্য করতে পারছেন না। বলল, গ্রামের সবাইয়ের মুখে যখন হাবিব ডাক্তারের সুনাম তখন নিশ্চয় তিনি ভালো।

গ্রামের সবাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করি নি, তোমার মতামত জানতে চাইছি?

তার মতো ভালো মানুষ আজকালের যুগে দেখা যায় না।

তুমি তার পরিচয় জান?

জানব না কেন? তার সঙ্গে আমার খুব ভালো জানাশোনা।

কোথায় বাড়ি? কার ছেলে? তিনি কি করেন? এসব জান?

হাবিব ডাক্তারের সম্পর্কে আজরাফ হোসেন যা বলেছিলেন, পারভেজও তাই বলল।

মুশতাক বিশ্বাস অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমিও তাকে ভালো মনে করি। তাই কতটা ভালো তোমার কাছে জানতে চাইলাম। আচ্ছা, ডাক্তার বিয়ে করেছে কিনা জান?

না, উনি এখনো বিয়ে করেন নি।

তাই নাকি? আমি তো মনে করেছিলাম, বৌ, ছেলেমেয়ে আছে। ওদের পদবী কি জান?

হাবিব ডাক্তারের দাদাজী হাসিবুর রহমান বিশ্বাস বংশের ঔরসে জন্ম নিলেও তার খালা-খালু খাঁ বংশের এবং তারা তাকে মানুষ করেছিলেন বলে তিনি খান পদবী গ্রহণ করেন। তাই হাবিব ডাক্তার পারভেজকে বলেছিল, তাদের পদবী খান। এখন মুশতাক বিশ্বাস ছেলেকে তাদের পদবী জিজ্ঞেস করতে পারভেজ বলল, খান।

পদবী শুনে মুশতাক বিশ্বাস কপাল কুঁচকে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

পারভেজ বলল, ডাক্তারের পদবী খান শুনে মনে হচ্ছে বিরক্ত হয়েছেন?

মুশতাক বিশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে বললেন, ভেবেছিলাম, ওর সঙ্গে আতিকার বিয়ে দেব; কিন্তু তুমি তো আমাদের বংশ গৌরব ও বংশের রীতিনীতি জান। বিশ্বাস বংশ ছাড়া অন্য কোনো বংশে আমরা ছেলেমেয়ের বিয়ে দিই না। বিশেষ করে খাঁ বংশকে আমরা কেন ঘৃণা করি, তা তুমিও জান। তাই ডাক্তার খাঁ বংশের ছেলে জেনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আব্বার অসুখের সময় যখন হাবিব ডাক্তারকে নিয়ে এসে চিকিৎসা করিয়েছিল, তখন তাকে আতিকার মতো পারভেজেরও খুব ভালো লেগেছিল। তারপর হেড স্যার আজরাফের কাছে পরিচয় জেনে তার প্রতি আরো ভক্তি-শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। তখন থেকে একটা কথা বারবার তার মনে হয়, ডাক্তারের সঙ্গে আদরের একমাত্র বোন আতিকার বিয়ে হলে সে সুখী হবে। কিন্তু আব্বা যে বিশ্বাস বংশ ছাড়া অন্য বংশে কিছুতেই আতিকার বিয়ে দেবেন না, তা জানে। তাই মনের ইচ্ছা এতদিন চেপে রেখেছিল। এখন আব্বার কথা শুনে সেই ইচ্ছাটা প্রবল হল। ভাবল, আব্বাকে যেমন করে হোক রাজি করাতেই হবে। তাই সাহস করে নিজের ইচ্ছার কথা বলে বলল, আজকাল কেউ বংশ বিচার করে না। বিচার করে ছেলের চরিত্র ও তাদের খানদান ভালো না মন্দ। ছেলে হিসাবে

হাবিব ডাক্তার যে কত ভালো, তা আপনি, আমি ও গ্রামের সবাই জানে। আর তার বাবার সম্পর্কে যা জেনেছি; তাতে মনে হয়, তিনি ধনী ও উচ্চ খানদানী বংশের ছেলে। আমার মনে হয়, বিয়ের আগে বা পরে তার বাবার পরিচয় জানার পর কেউ বংশ নিয়ে কথা তুলবে না। তা ছাড়া আপনি বোধহয় জানেন না, ইসলাম শুধু নিচু বংশে মানে যারা নাকি ছোটলোক অসভ্য, নীচ তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে নিষেধ করছে। নচেৎ ইসলামে উঁচু নিচু বংশ বলে কিছু নেই। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাঁর ও তাঁর রাসূল (দঃ) এর পথে জীবন পরিচালিত করে, তারাই দুনিয়াতে যেমন উচ্চ বংশ বলে পরিচিত, তেমনি পরকালেও আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা বেশি। আপনি আর অমত করবেন না আব্বা।

শাফিয়া বানু কিছুক্ষণ আগে এসে তাদের কথা শুনছিলেন, ছেলে থেমে যেতে বললেন, ডাক্তারকে আমারও খুব পছন্দ। আতিকার সঙ্গে মানাবে ভালো। পারভেজ ঠিক কথা বলেছে, তুমি রাজি হয়ে যাও।

মুশতাক বিশ্বাস ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, তুমি এখন যাও। চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। আর শোন, ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হলে একবার আমার কথা বলে আসতে বলবে।

পারভেজ চলে যাওয়ার পর শাফিয়া বানু বললেন, মেয়ের বয়স কত হল খেয়াল আছে? কবে থেকে তো পাত্র খুঁজছ, কই, কিছু করতে পারলে? আমি বলি কি হাবিব ডাক্তারকে হাত ছাড়া করা ঠিক হবে না। খাঁয়েদের হলে তো কী হয়েছে? ভালো ঘর ভালো ছেলে আজকাল পাওয়া খুব মুশকিল। এমন সোনার চাঁদ ছেলে পাবে কোথায়?

মুশতাক বিশ্বাস বললেন, আমিও হাবিব ডাক্তারকে জামাই করতে চাই; কিন্তু গ্রামের লোক যখন জানবে খাঁয়েদের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি তখন কী হবে?

কী আবার হবে? বিশ্বাস বংশের মধ্যে উপযুক্ত ছেলে না পাওয়া গেলে মেয়েকে কী চিরকাল আইবুড়ী করে ঘরে রেখে দেবে? তা ছাড়া ডাক্তার শহরের ছেলে, কোন বংশের ছেলে তা কি গ্রামের লোক জানছে? আর জানলেই বা কি? তোমার বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার সাহস আছে নাকি?

স্ত্রীর শেষের কথা শুনে মুশতাক বিশ্বাস খুশি হলেন। বললেন, তুমি ঠিক কথা বলেছ। ডাক্তারকে আসার জন্য পারভেজকে বলেছি, এলে আলাপ করে তার মতামত জানা যাবে।

শোন, ডাক্তার যদি আতিকাকে গ্রামের মেয়ে ভেবে বিয়ে করতে রাজি না হয়, তা হলে জমি-জায়গা ও টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে হলেও রাজি করাবে।

মুশতাক বিশ্বাস মৃদু হেসে বললেন, পারভেজের মা, সেকথা তোমার না বললেও চলতো। এমন গুটি চালব, ডাক্তার বেটা রাজি না হয়ে পারবে না।

শাফিয়া বানুও মৃদু হেসে বললেন, এত বছর তোমাকে নিয়ে সংসার করছি, আজ পর্যন্ত তোমাকে কোনো কাজে হারতে দেখি নি, এ কাজেও তুমি হারবে না, তা আমিও জানি। তবু একটু স্মরণ করিয়ে দিলাম আর কি।

এই জন্যইতো তোমাকে এত ভালবাসি বলে মুশতাক বিশ্বাস এদিক ওদিক তাকিয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন।

শাফিয়া বানুও এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, একি করছ? ছাড় ছাড়। এত বয়স হল, তবু রস কমল না।

মুশতাক বিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে বললেন, বয়স হলে মেয়েদের রস কমে যায় কেন বলতে পার?

শাফিয়া বানু কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, বলতে পারব না। তুমি তোমার রস নিয়ে থাক বলে সেখান থেকে চলে গেলেন।

কয়েকদিন পর এক বিকেলে বইরাপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসায় মিটিং ছিল। চামচা গিয়াসকে নিয়ে যাওয়ার সময় মুশতাক বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, হাবিব ডাক্তারের পরিচয় জানতে পারলে?

জি না মাতব্বর সাহেব। তবে চেষ্টায় আছি।

তোমাকে আর চেষ্টায় থাকতে হবে না। আর হাশেম আলির বাড়ির দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে না। আমি নিজেই জেনেছি, হাবিব ডাক্তারের মতো ভালো ছেলে আর হয় না।

গিয়াস খুব অবাক হয়ে ভাবল, মাতব্বর সাহেব কয়েকদিন আগে পর্যন্ত হাবিব ডাক্তারের উপর ক্ষ্যাপা ছিলেন। তার সম্পর্কে কার কাছে কি এমন শুনলেন যে, এখন আবার তার সুনাম করছেন! কিছু বুঝে উঠতে না পেরে চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর মুশতাক বিশ্বাস বললেন, তোমার কাছে ব্যাপারটা ঘোলাটে মনে হচ্ছে, তাই না?

গিয়াস বলল, আপনার মতো বুদ্ধিমান মানুষ শুধু এই গ্রামে না, আশপাশের কয়েকটা গ্রামেও নেই। তাই তো সব গ্রামের সালিশীতে আপনার ডাক পড়ে। আমি মূখ্যু লোক, একটু খোলাসা করে না বললে বুঝব কী করে?

মুশতাক বিশ্বাস নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে বললেন, বলছি শোন, আমি পাঁচ-ছ'দিন আগে পশ্চিমপাড়ায় আজরাফ মাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়াছিলাম। আজরাফ মাস্টার কেমন লোক তাতো জান। তার কাছেই হাবিব ডাক্তারের সবকিছু জেনেছি।

প্রায় সাত আট মাস আগে গিয়াসের দশ বছরের মেয়ে যয়নাবের ডাইরিয়া হয়ে মরামরা অবস্থা হয়েছিল। ঘরে কান্নাকাটিও পড়ে গিয়েছিল। সেই সময় হাবিব ডাক্তারকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে একজন ডেকে নিয়ে আসে। তার চিকিৎসায় যয়নাব বেঁচে যায়। গ্রামের সবার মতো গিয়াসও হাবিব ডাক্তারকে পীরের মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করে। মাতব্বর সাহেবকে শুধু খুশি রাখার জন্য তার বিরুদ্ধে একটু-আধটু মিথ্যে বলে। এখন মাতব্বরের কথা শুনে অবাক হলেও খুব খুশি হল। তা প্রকাশ না করে চুপ করে রইল।

কী হল, ভালো মন্দ কিছু বলছ না যে?

আপনি সবকিছু জেনে যা বললেন, তা ভালো ছাড়া কখনও মন্দ হতে পারে না। তবে হাশেম আলির মেয়ের ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখলে ভালো হত।

মুশতাক বিশ্বাস হেসে উঠে বললেন, তুমি অবশ্য ঠিক কথা বলেছ। তবে আমি কথায় কথায় ব্যাপারটা আজরাফ মাস্টারের কাছ থেকে জেনেছি। আসল ঘটনা হল, হাবিব ডাক্তার হাশেম আলিকে চিকিৎসা করছে। তাই মাঝে মাঝে যায়। সে সময় তার মেয়ের সঙ্গে হয়তো কিছুক্ষণ আলাপ করে। তুমিও তো জান, হাশেম আলির মেয়ে খুব পর্দানশীল। আর হাবিব ডাক্তার যে খুব ধার্মিক তাও তো জান?

গিয়াস হাসি মুখে বলল, আপনি যখন বলছেন, তখন আর কোনো চিন্তা নেই।

তা হলে বল, হাবিব ডাক্তারের সঙ্গে আতিকার বিয়ে দিলে কেমন হবে?

খুব ভালো হবে। দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাড়াতাড়ি সেদিন দেখান।

মুশতাক বিশ্বাস গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, গিয়াস।

মাতব্বর সাহেবের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে গিয়াস ঘাবড়ে গেল। ভাবল, কিছু ভুল বলে ফেললাম না তো? মিনমিনে গলায় বলল, জি মাতব্বর সাহেব বলুন।

কথাটা যেন আর কেউ না জানে।

গিয়াস স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, জি-জি, তাতো বটেই।

মিটিং সেরে ফেরার পথে খাঁপাড়া ছেড়ে মাঝপাড়ায় রশিদ শেখের পুকুরপাড়ের কাছে এসে মুশতাক বিশ্বাস পুকুরে ওপাড়ের একটা বড় নীম গাছের আড়ালে একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। যদিও সন্ধ্যায় আবছা অন্ধকার নেমেছে, তবু তাদেরকে চিনতে পারলেন। আতিকা নাদের আলির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে।

মুশতাক বিশ্বাসের পিছনে গিয়াস ছিল। মাতব্বরকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে সেও দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করে বলল, দাঁড়ালেন কেন মাতব্বর সাহেব। চলুন মাগরিবের নামাযের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মুশতাক বিশ্বাস দৃষ্টি সরিয়ে কিছুটা পথ আসার পর বললেন, কিছু দেখেছ?

জি, নাদের আলির পাখা গজিয়েছে।

পাখা কেটে দাও।

জি, তাই দেব।

শুধু পাখা নয়, আজ রাতেই ওকে একেবারে শেষ করে দেবে।

সেটা কি ঠিক হবে মাতব্বর সাহেব? তার চেয়ে পাখাটা কেটে দিলেই ভালো হবে। একেবারে শেষ করে দিলে, পুলিশের ঝামেলা হবে। ওরা গন্ধ শুঁকে শুঁকে একদিন না একদিন খুনীকে আবিষ্কার করবে। তা ছাড়া নাদের আলি হাবিব ডাক্তারের পেয়ারের। সেও কম কিছু করবে না।

ঠিক আছে, আপাতত পাখা কেটে দেয়ার ব্যবস্থা কর।

জি, সেটাই ভালো হবে।

এবার তুমি যাও বলে মুশতাক বিশ্বাস মসজিদের দিকে চলে গেলেন। নামায পড়ে গম্ভীর মুখে বাড়িতে ঢুকলেন।

শাফিয়া বানু জানেন, স্বামী মাদ্রাসার মিটিং-এ বইরাপাড়ায় গেছে। তাকে খুব গম্ভীর মুখে ফিরতে দেখে ভাবলেন, মিটিং এ ফলাফল ওনার মনের মতো হয় নি। কাছে এসে বললেন, শরীর খারাপ লাগছে?

মুশতাক বিশ্বাস স্ত্রীর কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, আতিকা কোথায়?

কেন? এই তো নামায পড়ল।

সন্ধ্যের আগে কোথায় ছিল?

তা বলব কি করে। আসরের নামায পড়ে হয়তো চাচাদের কারো বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল।

সেয়ানা মেয়ে কোথায় যায়, কি করে, খোঁজ রাখবে না?

ওকি ছোট যে, সব সময় ওর দিকে লক্ষ্য রাখব। মা হিসাবে যতদিন লক্ষ্য রাখার ততদিন রেখে মানুষ করেছি। এখন বড় হয়েছে, লেখাপড়া করেছে, এবার বাবা হিসাবে তোমার কর্তব্য, ভালো ঘরে ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দেয়া। ওর জুড়ি সব মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা বাপের বাড়ি এলে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে। ওর মনের দিকটা চিন্তা করে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়া উচিত। কিন্তু বাপ হয়ে সেই উচিত কাজটা তুমি করছ না কেন?

স্ত্রীর কথা শুনে মুশতাক বিশ্বাসের রাগ পড়ে গেল। বললেন, হ্যাঁ তুমি ঠিক কথা বলেছ। তবে আমি যে পাত্রের খোঁজ করি নি তা নয়। উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছি না বলে দেরি করছি।

কেন? সেদিন তো হাবিব ডাক্তারের কথা বললে? তার সঙ্গে আলাপ কর নি?

পারভেজের হাতে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, সে নাকি ঢাকা গেছে, দু-একদিনের মধ্যে ফিরবে। এখন যা বলছি শোন, মিটিং থেকে ফেরার সময়

মাঝপাড়ায় রশিদ শেখের পুকুরপাড়ে নাদের আলির সঙ্গে আতিকাকে আলাপ করতে দেখলাম, ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো ঠেকছে না।

শাফিয়া বানু চমকে উঠে সামলে নিলেন, বললেন, তুমি হয়তো ভুল দেখেছ। আতিকা নাদের আলির সঙ্গে আলাপ করতে যাবে কেন?

মুশতাক বিশ্বাস গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি একা দেখলে হয়তো তাই মনে হত; কিন্তু গিয়াসও সঙ্গে ছিল। সে তো আর ভুল দেখে নি? ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে, ওদের সম্পর্ক অনেক দিনের। শালা ফকিন্নীর বাচ্চার সাহস দেখে অবাক হচ্ছি, খাঁ বংশের কুত্তার বাচ্চা আমার মেয়ের সঙ্গে কিনা...কথাটা রাগে শেষ করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, পিঁপড়ের পাখা গজায় মরার জন্য। ঐ কুত্তার বাচ্চাটারও পাখা গজিয়েছে। আজ রাতেই বাছাধন কতধানে কত চাল বুঝতে পারবে।

আজ রাতেই স্বামী যে লোক দিয়ে নাদের আলির ক্ষতি করবে, তা শাফিয়া বানু বুঝতে পেরে আতঙ্কিত হলেন। বললেন, নাদের আলি কতটা দোষী সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কিছু করা ভালো। নচেৎ গ্রামে সালিশী বসলে তোমার সম্মান থাকবে? আমি চাই না, হঠাৎ করে কিছু করে তুমি সালিশের সম্মুখীন হও।

মুশতাক বিশ্বাস হো হো করে হেসে উঠে বললেন, শুধু এই গ্রামের নয়, আশপাশের পাঁচ-দশটা গ্রামের এমন কারো বুকের পাটা নেই, আমার নামে সালিশ ডাকবে।

এত বছর এ বাড়ির বৌ হয়ে এসেছি, সে কথা আর জানি না?

তা হলে কোনো দুশ্চিন্তা করো না। শুধু দেখে যাও কি করি। আর শোন, এ ব্যাপারে আতিকাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। তবে কখন কোথায় যায় লক্ষ্য রাখবে।

শাফিয়া বানু বললেন, ঠিক আছে, তুমি বস, চা-নাস্তা নিয়ে আসি।

হাবিব ডাক্তার নিষেধ করার পর আতিকা ও নাদের আলি পাঁচ-ছ'মাস কেউ কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে নি। কিন্তু আজ আতিকা থাকতে না পেরে গোপনে নাদের আলির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল। মাঝপাড়ায় রহিম শেখের পুকুর পাড়ের কাছে তার সঙ্গে দেখা হয়। তারপর তাকে নিয়ে পুকুরের ওপারের পাড়ে গিয়ে বলল, তোমাকে এতদিন না দেখে খুব খারাপ লাগছিল, তাই তোমাদের ঘরে যাচ্ছিলাম। এবার থেকে প্রতি সোমবার এখানে এই সময়ে থাকবে, আমি আসব।

নাদের আলি ভয় পেয়ে বলল, কিন্তু একদিন না একদিন কেউ দেখে ফেলবে। তখন কী হবে ভেবেছ?

আমি এভাবে গায়ে মাথায় কাপড় দিয়ে আসব, কেউ চিনতে পারবে না।

তবু নাদের আলির ভয় কাটল না। বলল, হাবিব ডাক্তার আমাদেরকে দেখা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানতে পারলে হয়তো আমাদের জন্য কিছুই করবেন না।

আজ এক বছরের বেশি হয়ে গেল, কই, কিছু করতে পেরেছেন?

উনি তলে তলে অনেক কিছু করছেন।

কি করেছেন শুনি?

একদিন আমি জিজ্ঞেস করতে শুধু বললেন, "আতিকাকে এনে রাখবে কোথায়? খাওয়াবে কি? সে বড় লোকের আদরের মেয়ে। এই বেড়ার ঘরে ডাল-ভাত খেয়ে থাকবে নাকি? আগে বাড়িঘর পাকা কর, জমি-জায়গা কিনে নিজে চাষবাস করে উন্নতি কর। তারপর আতিকাকে ঘরে তোলার ব্যবস্থা আমি করব।"

হাবিব ডাক্তারের কথামতো এসব করতে করতে তুমি যেমন বুড়ো হয়ে যাবে, আমিও তেমনি বুড়ী হয়ে যাব। তা ছাড়া মা-বাবা অতদিন আমাকে আইবুড়ী করে ঘরে রেখে দেবে বুঝি?

আমি তাকে সে কথা বলেছিলাম। বললেন, "ইনশাআল্লাহ্ এক দেড় বছরের মধ্যে তুমি সবকিছু করতে পারবে।"

তা এই এক বছরের মধ্যে তুমি কিছু এগোতে পেরেছ?

কিছু জমি-জায়গা কিনে চাষবাস করছি, দু'কামরা পাকা বাড়ির কাজও প্রায় শেষ করে এনেছি।

আতিকা অবাক হয়ে বলল, তাই না কী? তা তুমি এত টাকা-পয়সা পেলে কোথায়?

নাদের আলি কিছু না বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

আরে, কিছু না বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছ যে? মনে হচ্ছে আলাউদ্দিনের চেরাগ পেয়েছ?

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, আলাউদ্দিনের চেরাগই পেয়েছি।

দূর, ওটা তো আগের যুগের কল্পকাহিনী। আসল ব্যাপারটা বল তো।

আসল ব্যাপারটা বললে আলাউদ্দিনের চেরাগের মতো কল্পকাহিনী মনে হবে।

তা হোক, তবু বল।

বলা যাবে না। তবে এতটুকু বলতে পারি। "আল্লাহ যারে দেয়, ছাপ্পর ফাইড়া দেয়।"

ওটা তো একটা কথার কথা, আসল ব্যাপারটা বলা যাবে না কেন?

তাও বলা যাবে না। কারণ জানাজানি হয়ে গেলে আমি বিপদে পড়ে যাব। তবে যখন বিপদে পড়ার সম্ভাবনা কেটে যাবে তখন বলব।

আতিকা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে, তা হলে থাক, বলতে হবে না। পরেই না হয় শুনব।

এমন সময় নাদের আলির দৃষ্টি রাস্তার দিকে পড়তে মুশতাক বিশ্বাস ও গিয়াসকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠে বলল, এই, তোমার আব্বা ও গিয়াস চাচা আমাদেরকে দেখছেন।

কথাটা শুনে আতিকাও চমকে উঠে যখন রাস্তার দিকে তাকাল তখন মুশতাক বিশ্বাস ও গিয়াস মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করেছেন। তাদেরকে চলে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করল, তুমি ঠিক দেখেছ, আব্বা ও গিয়াস চাচা আমাদেরকে দেখেছে?

নাদের আলির মনে তখন ভয়ের ঝড় বইছে। কোনো রকমে বলল, হ্যাঁ, ওনারা আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার কিন্তু খুব ভয় করছে।

আতিকা বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? আমার মনে হয়, এতদূর থেকে আমাদেরকে চিনতে পারে নি। চিনতে পারলে আব্বা নিশ্চয় গিয়াস চাচাকে দিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে পাঠাত।

কি জানি, তোমার কথা হয়তো ঠিক। এবার তুমি যাও। তোমার আব্বা ঘরে গিয়ে তোমার খোঁজ করবেন। আর শোন, আমার মনে হয়, এখানে দেখা করা ঠিক হবে না। দু'একমাস যাক, তারপর না হয় দেখা যাবে।

আতিকা বলল, ঠিক আছে, আমি হালিমের হাতে খবর দিলে আসবে। তারপর তারা যে যার পথে চলে গেল।

মুশতাক বিশ্বাস ঘরে আসার আগে অন্য রাস্তা দিয়ে আতিকা ঘরে এসে নামায পড়ল। তারপর আব্বা ঘরে এসে মায়ের সঙ্গে যা কিছু কথাবার্তা বলেছে আড়াল থেকে তাদের সব কথা শুনে জানতে পারল, আব্বা ও গিয়াস চাচা তাদেরকে ঠিকই দেখেছে। আরো জানতে পারল, আব্বা-আম্মা হাবিব ডাক্তারের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চায়। আব্বা তাদেরকে দেখেছে জেনে ভয় পেলেও হাবিব ডাক্তারের সঙ্গে তার বিয়ের কথা জেনে ভয় পেল না। আম্মা চা-নাস্তা আনতে গেলে নিজের রুমে এসে ভাবল, যাক বাঁচা গেল। যখন এসব কথা জানাতে আম্মাকে নিষেধ করল তখন সেও নিশ্চয় আপাতত আমাকে কিছু বলবে না। সঙ্গে সঙ্গে আজ রাতেই নাদের আলির পাখা ভেঙ্গে দেয়ার কথা মনে পড়তে চমকে উঠল। তাকে সাবধান করার জন্য তখনই রওয়ানা দিল। এখন খাঁপাড়ায় যাওয়া তার যে উচিত নয়, সে কথা একবারও মনে পড়ল না। ততক্ষণে রাতের অন্ধকার নামলেও রাস্তায় লোকজন চলাচল করছে। মাথার কাপড়টা মুখের উপর

কিছুটা ঝুলিয়ে লোকজনকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগল। দু'একজন জিজ্ঞেস করল, কে তুমি, কোথায় যাবে? আতিকা না শোনার ভান করে তাদেরকে পাশ কেটে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল।

যারা বাড়ির কাজ করছে তাদেরকে বিদায় করে নাদের আলি ফুফুর সঙ্গে কথা বলছিল। এমন সময় আতিকাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। বলল, কী ব্যাপার? এই রাতের বেলায় আবার এলে কেন? কোনো বিপদ হয় নি তো?

আতিকা দ্রুত হেঁটে এসে হাঁপিয়ে পড়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমার কোনো বিপদ হয় নি। তবে আজ রাতে তোমার বিপদ হবে। গিয়াস চাচা তার লোকজন নিয়ে তোমাকে মারধর করতে আসবে শুনে তোমাকে সাবধান করতে এলাম। এখন চলি, জানাজানি হয়ে গেলে আব্বা আম্মা আস্ত রাখবে না। তুমি আজ রাতে ঘরে থেক না বলে যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমনি দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আতিকার কথা শুনে নাদের আলি ভয় পেলেও দ্রুত তার পিছন পিছন আসতে আসতে বলল, একটু দাঁড়াও, আমি তোমাকে কিছু দূর এগিয়ে দিই।

আতিকা না দাঁড়িয়ে যেতে যেতে বলল, এগিয়ে দিতে হবে না। তোমাকে আমার সঙ্গে কেউ দেখে ফেললে তখন দু'জনেরই বিপদ হবে। যা বললাম তাই করবে।

নাদের আলি থমকে দাঁড়িয়ে অন্ধকার পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ফিরে এসে ফুফুকে বলল, আমাকে ভাত দিয়ে তুমিও খেয়ে নাও। তোমাকে নিয়ে পশ্চিমপাড়ায় আজরাফ স্যারের বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাব।

নাদের আলির ফুফু হানিফা খাতুনের তিনবার বিয়ে হয়। প্রথম স্বামী পাঁচ-বছর তাকে নিয়ে সংসার করে। এই ক'বছরে পেটে বাচ্চা আসে নি বলে বাঁজা ভেবে তালাক দিয়ে সেই স্বামী আবার বিয়ে করে। দ্বিতীয় স্বামীও তাকে নিয়ে পাঁচ-ছ'বছর সংসার করে এবং একই কারণে তালাক দিয়ে আবার বিয়ে করে। আবার তৃতীয় স্বামী বিয়ের দু'বছরের মাথায় মারা যায়। তারপর বাপ-ভাই বিয়ে দিতে চাইলেও তিনি রাজি হন নি। সেই থেকে বাপ-ভাইদের সংসারে থাকেন। মা-বাপ অনেক আগে মারা গেছেন। ভাই-ভাবিও বন্যার বছরে মারা গেছেন। মা-বাবাকে হারিয়ে ফুফুই এখন নাদের আলির সব। তা ছাড়া হানিফা খাতুন যে বছর বিধবা হয়ে ফিরে আসেন। তখন নাদের আলি ছোট ছিল। তিনিই একরকম তাকে মানুষ করেছেন। স্কুলে পড়ার সময় যখন আতিকা তাদের বাড়িতে আসত তখন তার পরিচয় জানবার পর একদিন তিনি নাদের আলিকে মুশতাক বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের পূর্ব-পুরুষদের শত্রুতা ও শত্রুতার কারণ

জানিয়ে বলেছিলেন, আতিকার সঙ্গে তুই মেলামেশা করবি না। আর তাকেও বলে দিবি, সে যেন এ বাড়িতে না আসে।

সে কথা নাদের আলি একদিন আতিকাকে বলে। আতিকা তখন তরুণী। সেদিন ঘরে এসে মাকে জিজ্ঞেস করে খাঁয়েদের সঙ্গে নাকি আমাদের অনেকদিনের শত্রুতা?

শাফিয়া বানু বললেন, হ্যাঁ। খবরদার, খাঁয়েদের কোনো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করবি না।

খাঁয়েদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা কেন আম্মা?

তুই এখন ছেলে মানুষ, ওসব কথা জানার দরকার নেই। যখন আরো বড় হবি তখন নিজেই জানতে পারবি।

মায়ের কথায় আতিকা খুশি হতে পারল না। তাই একদিন দাদিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছিল।

জানার পর ভেবেছিল, নাদের আলির সঙ্গে আর মেলামেশা করবে না। কিন্তু ততদিনে তাকে ভালবেসে ফেলেছে। তাই খুব বেশি দিন তার সঙ্গে দেখা না করে থাকতে পারে নি।

নাদের আলিরও একই অবস্থা। তবু আতিকাকে অনেক বুঝিয়েছে। কিন্তু কোনো কাজ হয় নি।

তারপর তারা যে সম্পর্ক রেখেছে ও গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করে তা হানিফা খাতুন জানতেন না। কয়েক মাস আগে যেদিন হাবিব ডাক্তার নাদের আলির সঙ্গে এসে পরিচয় দিয়ে বলল, সে তাদেরই বংশের ছেলে এবং যেমন করে হোক নাদের আলির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আতিকাকে বৌ করে করে আনবে সেদিন জানতে পারেন। তারপর হাবিব ডাক্তার যে নাদের আলিকে জমি-জায়গা কিনে দিয়েছে ও পাকা বাড়ি করে দিচ্ছে তাও জানেন। তাই আজ আতিকা যখন বিপদের কথা বলে সাবধান করে দিয়ে চলে গেল এবং নাদের আলি পশ্চিমপাড়ায় আজরাফ মাস্টারের বাড়িতে রাত কাটাবার কথা বলল তখন জিজ্ঞেস করলেন, আজরাফ মাস্টার হাবিব ডাক্তারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ও তোর ও আতিকার সম্পর্কের কথা জানে?

নাদের আলি বলল, হ্যাঁ জানে।

তা হলে এক কাজ কর, খেয়ে তুই চলে যা, আমি এখানে থাকি।

এ তুমি কি বলছ ফুফু? তোমাকে একা রেখে গেলে ওরা আমাকে না পেয়ে তোমার উপর অত্যাচার করবে।

এমন সময় হাবিব ডাক্তারের গলা শুনতে পেল।

নাদের আলি ঘরে আছ না কি?

তার গলা পেয়ে নাদের আলির ভয় কেটে গেল। বলল, আসুন ডাক্তার ভাই। হাবিব ডাক্তার পরিচয় দেয়ার পর নাদের আলি তাকে ডাক্তার ভাই বলে ডাকে।

হাবিব ডাক্তার কাছে এসে সালাম বিনিময় করে বলল, তোমাদের সব কথা শুনেছি। কাউকেই কোথাও যেতে হবে না। মাঝপাড়ায় রুগী দেখতে এসেছিলাম, পথে আতিকার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তার কাছে সবকিছু শুনে এখানে এলাম। তারপর হানিফা খাতুনকে উদ্দেশ্য করে বলল, খালাআম্মা, কোনো চিন্তা করবেন না। আজ আমিও আপনাদের সঙ্গে থাকব।

হানিফা খাতুন বললেন, কিন্তু ওরা যদি দলে ভারি হয়।

হাবিব ডাক্তার বলল, আল্লাহ ভরসা। তারপর নাদের আলিকে বলল, লাঠি দু'গাছা যত্ন করে রেখেছ তো?

নাদের আলি বলল, হ্যাঁ রেখেছি।

হাবিব ডাক্তার বলল, ওরা রাত বারটার পরে আসবে তো আগে আসবে না। আমি পশ্চিমপাড়ায় যাচ্ছি, আজরাফ স্যারের সঙ্গে একটু দেখা করে আসি। ওখান থেকে এসে খাওয়া-দাওয়া করব। তারপর কেউ কিছু বলার আগে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রাত একটার দিকে গিয়াস ছয় সাতজন লোক নিয়ে নাদের আলিকে মেরে তার হাত পা ভেঙ্গে দেয়ার জন্য খাঁপাড়ায় এল। তারপর তার ঘরের কাছে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে গিয়াস আবছা দেখতে পেল, উঠোনের মাঝখানে সাদা পোশাকে লম্বা একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে পাঁচ ব্যাটারী টর্চ ছিল, টর্চ জ্বেলে যা দেখল, তাতে সবাইয়ের আত্মারাম খাঁচা। মাথায় সাদা পাগড়ী, চোখ ছাড়া সাদা কাপড়ে মুখ পেচান, গায়ে লম্বা সাদা ঝুল পিরান, হাতে একটা বড় লাঠি। চোখ দু'টো যেন আগুনের ভাটার মতো জ্বলছে। গিয়াসের সঙ্গীরা ওরে বাবারে জিন বলে ছুট দিল। গিয়াস সবার পিছনে পড়ে গেল।

হাবিব ডাক্তার নাদের আলিকে কিছু পরামর্শ দিয়ে এই পোশাকে লাঠি হাতে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। আর নাদের আলি বাস্তুর কিনারের বড় আমগাছের আড়ালে লাঠি হাতে লুকিয়েছিল। হাবিব ডাক্তারের পরামর্শ মতো পলায়নপর গিয়াসের ডান পায়ে প্রচণ্ড জোরে লাঠি দিয়ে আঘাত করল।

গিয়াস বাবারে মেরে ফেলল রে বলে আর্তচিৎকার করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। লাঠির আঘাতে তার পা ভেঙ্গে গেলেও জান বাঁচাবার জন্য ভাঙ্গা পা নিয়ে একপায়ে নেংচি কাটতে কাটতে ছুটল। কিছুটা এসে যখন চলতে পারল না তখন সঙ্গীদের ডাক দিয়ে বলল, তোরা আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যা, আমার একটা পা ভেঙ্গে গেছে।

সঙ্গীরা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে তাকে ধরে ধরে নিয়ে যেতে লাগল।

নাদের আলি যে গিয়াসের পায়ে লাঠির বাড়ী দিয়েছে, গিয়াস তা জানতে পারে নি। তাই বলল, জিনটা উঠোন থেকে লাঠি ফিঁকে মেরেছে। যে রকম যন্ত্রণা হচ্ছে, তাতে করে মনে হয় পাটা ভেঙ্গে গেছে।

সঙ্গীদের একজন বলল, নানার কাছে জিনের গল্প শুনেছিলাম, আজ চোখে দেখলাম। বারেক তুমি টর্চ জ্বেলেছিলে, নচেৎ জিনটা সবাই এর পা ভেঙ্গে দিত।

গিয়াস যাদেরকে নিয়ে এসেছিল, তারা সবাই লেঠেল। তাদের একজন শুধু তার চাচাত ভাই। আর বাকি সবাই কামড়ীপাড়ার লোক। তারা গিয়াসকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। গিয়াস ও ঐ লোকটির বাড়ি মাঝপাড়ায়।

পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত গিয়াস আসছে না দেখে মুশতাক বিশ্বাস বদরুল নামে একজন লোককে তাকে ডেকে নিয়ে আসতে মাঝপাড়ায় পাঠালেন।

গিয়াস পায়ের ব্যথায় সারারাত ছটফট করেছে। সকালে ছেলে লতিফকে কার্পাসডাঙ্গা হেলথ কমপ্লেক্সে হাবিব ডাক্তারকে আনতে পাঠিয়েছিল।

হাবিব ডাক্তার এসে পায়ের অবস্থা পরীক্ষা করে বলল, এ যে দেখছি কেউ শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করে পায়ের হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে। আল্লাহ না করুক, হাড় জোড়া না লাগলে হাঁটুর নিচ থেকে কেটে বাদ দিতে হবে।

গিয়াস হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, অমন কথা বলবেন না ডাক্তার সাহেব। পা কেটে বাদ দিলে ছেলেমেয়েদের মুখের আহার জোটাব কি করে? আপনি খুব আল্লাহওয়ালা ডাক্তার। পা যাতে কেটে বাদ দিতে না হয় সেই ব্যবস্থা করুন। আমার বিশ্বাস আপনি চেষ্টা করলে আমার পা ভালো করে দিতে পারবেন।

আমি ভালো করার কে? সবকিছু করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। ডাক্তারী বিদ্যামতো চেষ্টা করব। বাকি তিনি যা করার করবেন। তবে কয়েকটা কথা বলব, সেগুলো মেনে চলে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করুন। তিনি গফুর রহিম, ইচ্ছা করলে আপনার পা কেটে বাদ না দিয়েও ভালো করে দিতে পারেন।

আপনি বলুন ডাক্তার সাহেব, আপনার সব কথা মেনে চলব।

হাবিব ডাক্তার এতক্ষণ পায়ে প্লাস্টার করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

এবার কাজ শুরু করে বললেন, তার আগে যা জিজ্ঞেস করব, সত্য উত্তর দেবেন। পাটা এভাবে ভাঙল কী করে?

সত্য মিথ্যা কোনোটাই বলতে না পেরে গিয়াস চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হাবিব ডাক্তার বলল, কী হল, চুপ করে আছেন কেন?

একজন লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরেছিল।

কে বাড়ি মেরেছে? আর কেনই বা মেরেছে?

এই কথারও উত্তর দিতে না পেরে গিয়াস চুপ করে রইল।

হাবিব ডাক্তার আর কোনো প্রশ্ন না করে প্লাস্টারের কাজ শেষ করল। তারপর বলল, আপনি বোধ হয় জানেন, সত্য কোনোদিন গোপন থাকে না। দু'দিন আগে পরে সবাই জেনে যাবেই। এখন বলতে দ্বিধা করছেন কেন? কি এমন ঘটনা হয়েছিল, লোকটা লাঠি মেরে আপনার পা ভেঙ্গে দিল?

গিয়াস লজ্জায় ঘটনাটা বলতে না পেরে মাথা নিচু করে বসে রইল।

হাবিব ডাক্তার বলল, ঘটনাটা বলতে যখন লজ্জা করছে তখন আপনার ঈমান ও বিবেক দু'টোই আছে। হাদিসে আছে, আমাদের নবী (দঃ) বলেছেন, "লজ্জা ঈমানের অর্ধেক। যার লজ্জা নেই, তার ঈমানও নেই।" আর যার ঈমান আছে তাকে মুসলমান বলে। "এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই।" এটাও কুরআন হাদিসের কথা। এক ভাই আর এক ভাইয়ের ক্ষতি করতে পারে কী? যদি কেউ করে, তবে একদিন না একদিন তার দ্বারা অথবা অন্যের দ্বারা তারও ক্ষতি হবে। শুনুন, আমি এখানে দু'বছরের বেশি হয়ে গেল এসেছি, ডাক্তার হিসাবে আশপাশের গ্রামের প্রায় সব বাড়িতেই রুগী দেখতে গিয়ে সবার সঙ্গে কম বেশি পরিচয় হয়েছে। কে কেমন তাও কিছু কিছু বুঝেছি। আপনি শক্তি সামর্থবান লোক হয়ে একজনের পিছন পিছন ঘোরেন, সত্যি মিথ্যা বলে তোষামোদ করেন ও তার কথামতো বিবেক বিসর্জন দিয়ে অন্যের ক্ষতি করেন। এসব করা কী উচিত? আল্লাহ যতটুকু জমি-জায়গা দিয়েছেন, চাষবাস করুন। তাতে সংসার না চললে অন্য কোনো সৎ পথে রুজী রোজগার করার চেষ্টা করুন। তাতে করে ইহকাল ও পরকালের জীবনে সুখ-শান্তি পাবেন। এই যে আজ এরকম বিপদে পড়লেন, কেন পড়লেন চিন্তা করেছেন? নিশ্চয় কারো ক্ষতি করতে গিয়েছিলেন? ছেলেমেয়েরা সাধারণত মা-বাবাকে অনুসরণ করে। আপনার ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে, তাদের কাছে সৎ বাবা হওয়ার চেষ্টা করুন। আপনাকে অসৎ দেখলে তারাও বড় হয়ে অসৎ হবে। যাক, আজ আর বেশি কিছু বলব না। শুধু এতটুকু বলব, যারা অন্যের ক্ষতি করে, পারতপক্ষে তারা নিজেরই ক্ষতি করে। আর যারা অন্যের ভালো করার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন। আর সেই সাহায্য কোনো একজনের দ্বারা করান। সৎভাবে সংসার চালাতে গেলে যদি অভাব অনটনে পড়েন, তা হলে ব্যবসা করুন। টাকা পয়সা লাগলে আমি আপনাকে কর্জে হাসানা দেব। যখন সুযোগ

সুবিধে হবে তখন শোধ করে দেবেন। তবে এসব কথা কাউকে বলবেন না। তারপর প্রেসক্রিপশন করে দিয়ে বলল, ওষুধ কেনার টাকা না থাকলে আপনার ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এবার আসি বলে সালাম বিনিময় করে হাবিব ডাক্তার চলে গেল।

গিয়াস আগে হাবিব ডাক্তারকে যতটা না আল্লাহওয়ালা বলে জানত, এখন তার কথা শুনে আরো বেশি আল্লাহওয়ালা বলে মনে হল। ভাবল, আজকালের যুগের এরকম মানুষও তা হলে আছে? সিদ্ধান্ত নিল, সে আর মুশতাক বিশ্বাসের চামচাগিরী করবে না। পা ভালো হয়ে গেলে গতর খাটিয়ে সংসার চালাবে এবং হাবিব ডাক্তারের কাছ থেকে টাকা হাওলাত নিয়ে বাজারে যে কোনো ব্যবসা করবে।

এমন সময় তার ছেলে লতিফ এসে বলল, বদরুল চাচা এসেছে।

গিয়াস বলল, এখানে আসতে বল।

বদরুল এসে তার একটা পা প্লাস্টার করা দেখে অবাক হয়ে বলল, কাল তোমাকে ভালো দেখলাম, কি এমন ঘটনা ঘটল যে, পা প্লাস্টার করতে হল? আজ তুমি যাওনি বলে মাতব্বর সাহেব তোমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠালেন।

ঘটনা বলা যাবে না। তুমি মাতব্বর সাহেবকে বলবে, তার কাজ করতে গিয়ে আমার এই অবস্থা হয়েছে। তাই যেতে পারি নি।

বদরুল ফিরে গিয়ে গিয়াসের কথাগুলো মুশতাক বিশ্বাসকে বলল।

মুশতাক বিশ্বাসের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। বদরুলকে বলল, ঠিক আছে, তুমি তোমার কাজে যাও।

বদরুল চলে যাওয়ার পর চিন্তা করতে লাগলেন, গিয়াসের পা ভেঙ্গেছে ভাঙ্গুক, কিছুদিনের মধ্যে ভালো হয়ে যাবে; কিন্তু নাদের আলির কি করল জানাল না কেন?

বিকেলে গিয়াসের বাড়িতে গিয়ে তার অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা বলতো শুনি।

ঘটনা যা কিছু ঘটেছিল গিয়াস সে সব বলে বলল, নাদের আলির কেউ কখনও এতটুকু ক্ষতি করতে পারবে না। তার বাড়িতে জিন থাকে। যারা যাবে তাদের অবস্থা আমার মতই হবে।

মুশতাক বিশ্বাস বললেন, তোমার দলবলের সবার কী একই অবস্থা হয়েছে?

না, তারা জিনটাকে দেখে আগেই দৌড় দিয়েছিল। আমি পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম। তাই জিনের লাঠির বাড়ি আমার উপরেই পড়েছে।

মুশতাক বিশ্বাস চিন্তিত মুখে বললেন, ওদের বাস্তুতে জিন থাকে কই, তাতো কখনো শুনি নি? বাপ-দাদাদের মুখেও শুনি নি। তুমি হয়তো ভুল দেখেছ।

ভুল দেখি নি মাতব্বর সাহেব। পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ জ্বেলে দেখেছি। তা ছাড়া সঙ্গে যারা ছিল, তারাও কী ভুল দেখেছে?

মুশতাক বিশ্বাস চিন্তিত মুখে বললেন, তা হলে নাদের আলিকে শায়েস্তা করবে কী করে?

গিয়াস বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, আমি তাকে শায়েস্তা করতে পারব না। একটা লাঠির ঘা মেরে জিনটা বলল, আবার যদি নাদের আলির কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করিস, তা হলে তোকে একবারে জানে শেষ করে দেব। তাই ভেবেছি, আর কারো ক্ষতি করার মতো কাজ আর করব না। নিজের যতটুকু আছে তাতে গতর খাটিয়ে একবেলা একসন্ধে খেয়ে হলেও সংসার চালাব।

তার কথা শুনে মুশতাক বিশ্বাস বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, তোমার সঙ্গে কারা গিয়েছিল?

আমার চাচাত ভাই রফিক আর চারজন কামড়ীপাড়ার লাঠিয়াল, তারপর তাদের নাম বলল।

মুশতাক বিশ্বাস গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, পা প্লাস্টার করল কে?

হাবিব ডাক্তার।

সে তো ঢাকায় গিয়েছিল শুনেছিলাম? ফিরল কবে?

তাতো জানি না। সকালে লতিফকে কার্পাসডাঙ্গায় পাঠিয়েছিলাম তাকে ডেকে নিয়ে আসতে। দুপুরের আগে এসেছিলেন।

মুশতাক বিশ্বাস আর কিছু না বলে ফিরে এসে রসুকে কামড়ীপাড়ায় পাঠালেন, ঐ চারজন লেঠেলকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য।

সন্ধ্যের পর তারা এলে মুশতাক বিশ্বাস তাদের কাছে ঘটনাটা জানতে চাইলেন।

গিয়াস যা যা বলেছিল, লেঠেলরাও তাই বলল। আরো বলল, আমরা আর কোনো দিন নাদের আলির ক্ষতি করার চেষ্টা করব না।

গিয়াসের কথা মুশতাক বিশ্বাস, বিশ্বাস করতে না পেরে তার সঙ্গী লেঠেলদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তারাও যখন একই কথা বলল তখন বিশ্বাস না করে পারলেন না। তাদেরকে বিদায় করে রসুকে বললেন, নাদের আলিকে মেরে তার হাত-পা ভেঙে দেয়ার জন্য গিয়াস এদেরকে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর যা ঘটেছে, সবকিছু তো শুনলে, তুমি চেষ্টা করে দেখবে না কী?

রসুর বাড়ি দরগাতলা পাড়ায়। মুরব্বীদের মুখে শুনেছে, এখানে কোনো এক পীরের দরগা ছিল। তখন গভীর রাতে ঐ দরগায় অনেক জিন যাতায়াত করত। এখন দরজা না থাকলেও জিনদেরকে ঐ এলাকায় যাতায়াত করতে অনেকে দেখেছে। একবার রসুর এক দাদা গভীর রাতে প্রকৃতির ডাকে ঐদিকে

গিয়েছিল। তাকে নাকি জিনেরা মেরে ফেলে। সকালে সেখানে তার লাশ পাওয়া গিয়েছিল। সেই থেকে ঐ জায়গাটা বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। রসু তখন আট-দশ বছরের ছেলে। দাদার লাশ দেখে ও জিনে মেরে ফেলেছে শুনে খুব ভয় পেয়েছিল। সেই থেকে জিনকে রসু ভীষণ ভয় পায়। এখন আবার লেঠেলদের মুখে নাদের আলির বাস্তুতে জিন আছে শুনে সেই ভয় আরো বেড়ে গেল। মুশতাক বিশ্বাসের কথা শুনে ভয়ার্তস্বরে বলল, না মাতব্বর সাহেব, জিনকে আমি খুব ভয় করি।

মুশতাক বিশ্বাস দমবার পাত্র নন। রসুকে বিদায় করে চিন্তা করলেন, প্রথমে কোনো একজন বড় খোনকার এনে নাদের আলির বাস্তুর জিনকে তাড়াতে হবে। তারপর নাদের আলির ব্যবস্থা করবেন। তার আগে হাবিব ডাক্তারের সঙ্গে আতিকার বিয়ের কাজটা মিটিয়ে ফেলতে হবে।

এশার নামায পড়ে ছেলেকে ডেকে বললেন, পরশু শুক্রবার তোমার দাদাজীর মৃত্যুবার্ষিকী। হাবিব ডাক্তার ঢাকা থেকে ফিরেছে। কাল তুমি নিজে গিয়ে তাকে আমার কথা বলে আসতে বলবে। তোমার দাদাজীর মৃত্যুবার্ষিকীর কথা জানাবে না।

পারভেজ বলল, ঠিক আছে আব্বা, তাই হবে।

ছয়

হাবিব ডাক্তার ঢাকা থেকে দু'দিন পরে ফেরার কথা বলে গেলেও ব্যাংক থেকে টাকা তোলার ব্যাপারে এক সপ্তাহ দেরি হল। বিকেলে পৌঁছে সাগীর ডাক্তারের মুখে সূতাপাড়ায় রুগীর মুমূর্ষু অবস্থার কথা শুনে দেখতে গিয়েছিল। সেই সাথে টাকাটা নাদের আলিকে দেয়ার জন্য খাঁপাড়ায় গিয়েছিল।

আজ পারভেজকে দেখে ভাবল, সেদিনের ঘটনার ব্যাপারে মুশতাক বিশ্বাস ছেলেকে পাঠান নি তো? সালাম বিনিময় করে জিজ্ঞেস করল, কারো অসুখ-বিসুখ করেছে না কী?

পারভেজ বলল, না। আব্বা আপনাকে কাল সকালের দিকে যেতে বলেছেন।

কারো যখন কিছু হয় নি তখন বিকেলে গেলে হয় না? সকালের দিকে ঠাকুরপুরে দু'তিনটে রুগী দেখতে যাব।

ঠাকুরপুরে বিকেলে যাবেন। আব্বা আপনাকে অতি অবশ্য সকালে যেতে বলেছেন।

ঠিক আছে, সকালের দিকেই যাব।

তা হলে আসি বলে পারভেজ বিদায় নিয়ে চলে এল।

আজ শুক্রবার। হেলথ কমপ্লেক্স বন্ধ। তাই হাবিব ডাক্তার সকাল আটটার দিকে কুতুবপুর রওয়ানা দিল। মুশতাক বিশ্বাসের বাড়ির কাছে এসে দেখল, অনেক লোকজনের সমাগম। বৈঠকখানার উঠোনের একপাশে বড় ডেগচিতে বাবুর্চিরা রান্নাবান্না করছে। আর একদিকে তিনটে গরু ও চারটে খাসি জবাই করা হয়েছে। লোকজন সেগুলোর গোস্ত কাটাকাটি করছে। অবাক হয়ে ভাবল, আজ আতিকার বিয়ে নয় তো? সেই জন্যই কি মুশতাক বিশ্বাস আজ সকালে আসার জন্য পারভেজকে পাঠিয়েছিলেন? আবার ভাবল, তা কি করে সম্ভব? আতিকা এত সহজে রাজি হওয়ার মতো মেয়ে তো নয়? না তাকে জোর করে বিয়ে দিচ্ছে?

গ্রামের লোকজন সবাই তাকে চেনে। কয়েকজন দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে সালাম দিয়ে বলল, ডাক্তার সাহেব যে, আসেন আসেন।

হাবিব ডাক্তার সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? এত রান্নাবান্না কিসের?

তাদের একজন বলল, সেকথা পরে শুনবেন। এখন চলুন বৈঠকখানায় বসবেন।

পারভেজ বাবুর্চিদের সঙ্গে কথা বলছিল। তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে সালাম বিনিময় করে বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

যেতে যেতে হাবিব ডাক্তার বলল, কী ব্যাপার বলুন তো? এত আয়োজন কি জন্য?

আজ আমার দাদাজীর মৃত্যুবার্ষিকী। আপনি এসেছেন, আব্বা খুব খুশি হবেন। আপনার আসতে দেরি দেখে একটু আগে আব্বা কার্পাসডাঙ্গায় যেতে বলছিলেন। বৈঠকখানায় এসে বলল, বসুন, আব্বাকে ডেকে নিয়ে আসছি।

একটু পরে মুশতাক বিশ্বাসকে আসতে দেখে হাবিব ডাক্তার দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন?

সালামের উত্তর দিয়ে মুশতাক বিশ্বাস বললেন, ভালো। তারপর তাকে বসতে বলে নিজেও একটা চেয়ারে বসে বললেন, শুনলাম ঢাকা গিয়েছিলেন, কবে ফিরলেন?

তিন চারদিন হল।

ওখানকার, মানে তোমাদের বাড়ির সব খবর ভালো?

মুশতাক বিশ্বাস তাকে যে একটু বাঁকা চোখে দেখেন, তা হাবিব ডাক্তার জানে। তাই আজ তার কতাবার্তায় আন্তরিকতা দেখে একটু অবাক হল। বলল, জি, সব খবর ভালো।

এমন সময় পারভেজ কয়েক পদের নাস্তা নিয়ে এলে মুশতাক বিশ্বাস বললেন, নাস্তা খেয়ে ওর সঙ্গে গল্প কর। জেনেছ বোধহয়, আজ পারভেজের দাদাজীর মৃত্যুবার্ষিকী। মসজিদে শবিনা খতম হচ্ছে। জুম্মার নামাযের পর বখশানো হবে। দুপুরে গ্রামের লোকজনদের খাওয়ান হবে। সবকিছু দেখাশোনা করতে হচ্ছে। এখন যাই, পরে আপনার সঙ্গে একটা জরুরী আলাপ করব।

কুতুবপুর গ্রামের মধ্যে বিশ্বাসপাড়ায় জুম্মা মসজিদ। তাই গ্রামের সবাই এখানে জুম্মার নামায পড়তে এসেছে। বইরাপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার চারজন শিক্ষক ও ছাত্ররাও এসেছে। জুম্মার নামাযের শেষে মিলাদ ও দো'য়া দরুদ পড়ার পর বখশানোর সময় ইমাম সাহেব, হাফিজিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক যিনি হাফিজ ও মুফতি, তাকে দো'য়া করার কথা বললে তিনি আবার ইমাম সাহেবকেই দো'য়া করতে বললেন।

হাবিব ডাক্তার মাঝখান থেকে বলে উঠল, আপনারা বেয়াদবি নেবেন না। আমার মনে হয় মাতব্বর সাহেবরই দো'য়া করা উচিত।

হাবিব ডাক্তারের কথা শুনে সমস্ত মুসুল্লী অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। মসজিদের ভিতর ও বাইরে কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করতে লাগল।

এবার হাবিব ডক্তার দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আপনারা কেউ কিছু বলছেন না কেন, আমি কি ভুল কিছু বলে ফেললাম?

আজরাফ হোসেন জানেন, হাবিব ডাক্তার ধর্মের প্রচুর জ্ঞান রাখেন। নিশ্চয় এ ব্যাপারে কিছু বলতে চান। তাই কেউ কিছু বলার আগে বললেন, কিন্তু এখানে বেশ কয়েকজন হাফেজ ও আলেম রয়েছেন, তাঁদের উপস্থিতিতে সাধারণ একজন মানুষের দো'য়া করা কি ঠিক হবে?

হাবিব ডাক্তার বলল, আমি জানি অন্যান্য ইবাদতের মতো দো'য়া করাও একটা ইবাদত। শুধু তাই নয়, হাদিসে আছে, নবী (দঃ) বলেছেন, "প্রার্থনা (দো'য়া) ইবাদতের মজ্জা (মূল)।[১]" তা হলে চিন্তা করে দেখুন, সেই দো'য়া নিজে না করে হাদিয়া-তোফা দিয়ে অন্যকে দিয়ে কি করান উচিত? তা ছাড়া যে উদ্দেশ্যে মাতব্বর সাহেব এই দো'য়ার আঞ্জাম করেছেন, তাঁরই তো করা উচিত। কারণ নিজের মরহুম আব্বার ও মুরব্বীদের মাগফেরাতের জন্য দো'য়া করার সময় ওঁর দিল যতটা কাঁদবে, অন্য কারো দিল কী ততটা কাঁদবে? আরো দু'একটা কথা না বলে পারছি না, মৃত্যুবার্ষিকী বলে ইসলামে কোনো দলিল নেই। যদি থাকত, তা হলে সাহাবীরা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতেন। মনে রাখবেন, ইসলামের যে সব জিনিসের কোনো অকাট্য

---

১ বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ)—তিরমিযী।

দলিল নেই, সেই সব কাজ যদি সওয়াবের আশায় করা হয় এবং তা সমাজে প্রচলিত হয়ে যায়, তা হলে তাকে বেদয়াত বলে। এই যে মাদ্রাসার উস্তাদ ও ছাত্রদের দিয়ে কুরআন খতম করান হয়েছে, নিশ্চয় তাদেরকে টাকা-পয়সা নজরানা বা হাদিয়া দেবেন। এটা ও ইসলামে জায়েজ নয়। আলেম, হাফেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রদের নজরানা বা হাদিয়া দেয়া খুব সওয়াবের কাজ, এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এসব দেয়াও ধনীদের উচিত। কিন্তু ঐসব দিয়ে তাদের দ্বারা কুরআন খতম করান বা দো'য়া করান মোটেই উচিত নয়। কারণ এসব আল্লাহর কাছে কবুল হবে না বরং এই টাকা-পয়সা দেয়া নেয়াও না-জায়েজ হবে। প্রচলিত খতমে শবিনা সম্পর্কে মুফতি মুঃ ইবরাহীম খান, খাদেম মেখল হামিউসসুন্নাহ মাদ্রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, তাঁর লিখিত শরীয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার বইতে লিখেছেন, "খতমে শবিনা এবং শবিনা খতম মানে, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকায়ই দুই তিনজন হাফেজ সাহেব মিলে, পালাক্রমে একরাতে কুরআনের খতমের প্রথা দেখা যায়। এটা ধর্মের কিছুই নয়, বরং বিদআতে সাইয়্যেয়াহ এবং মাকরূহে তাহরীমা। কেননা কুরুনো সালাসায় (তিন স্বর্ণযুগ)-এ বিশেষ পদ্ধতিতে খতমের কোনো নাম গন্ধও ছিল না। ইবাদতের আকারে ইহা সম্পূর্ণ একটি নতুন কাজ। হুজুর (দঃ) ফরমান—এবং গায়রে দ্বীনকে দীন মনে করা এবং ইহা সাওয়াবের কাজ বলে বিশ্বাস করা অবশ্যই সীমা অতিক্রম করা। কুরআন-হাদিসে অকাট্য দলিল হল,...."সাধারণভাবে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করা হল মুস্তাহাব। আর ইহা শ্রবণ করা ওয়াজিব।" আল্লাহ কুরআন মজিদে বলেছেন, "আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন মনোনিবেশের সহিত উহা শ্রবণ করিও এবং চুপ থাকিও, যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়।"[১] সর্বাবস্থায় সকলের জন্য কুরআন তেলাওয়াত শ্রাবণ করা, বিশেষ করে যারা মাজুর, রোগী বা প্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্তশীল, তাদের জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অথচ শ্রবণকারী মাত্রই শ্রবণ করা ওয়াজীব। সুতরাং শ্রবণ ত্যাগ করার কারণ যেহেতু তেলাওয়াতকারী ও এর আমন্ত্রণকারী হয়েছে। তাই গুনাহগার তারাই হবেন। কেননা ঐ সমস্ত লোক শ্রবণ থেকে মাজুর।

আলমগীর কেতাবে আছে, "ফিকাহের কিতাব লেখায় মগ্ন ব্যক্তির নিকট যদি কেউ কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করে আর কিতাব লেখার কারণে তার জন্য শ্রবণ করা সম্ভব না হয়, তা হলে তেলাওয়াতকারীই গুনাহগার হবে, লেখকের কোনো গুনাহ হবে না। এমনিভাবে রাত্রিবেলায় ঘরের ছাদের উপর যদি কেউ উচ্চস্বরে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করে, তা হলে সে গুনাহগার হবে। এ বর্ণনাটুকু আলোচ্য বিষয়ের সাথে মিল রাখে। হযরত আবদুল্লাহ বিন

১ সূরা-আল আরাফ, আয়াত—২০৪, পারা—৯।

অমর এর বর্ণনা—মিশকাত শরীফ: "তিন দিনের কমে যে কুরআন খতম করে সে কুরআনের অর্থ বুঝে নাই। মিশকাত শরীফের টীকায় আল্লামা তিবি (রঃ) থেকে বর্ণিত।" সিদ্ধান্তমূলক কথা হল, কুরআন মজিদ খতম করার ব্যাপারে চল্লিশ দিনের বেশি বিলম্ব করা এবং তিনদিনের কমে শেষ করা উভয়টাই মাকরুহ।

যে সমস্ত বুজুর্গগণ একরাত্রে ও একদিনে কুরআন খতম করেছেন বলে প্রসিদ্ধ, তা ছিল সাধনামূলক। তাও আবার অতি গোপনে ও নির্জনে, প্রকাশ্যে নয়। এটা ছিল প্রভুর প্রগাঢ় ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। দাওয়াত গ্রহণ করে টাকার বিনিময়ে ছিল না। খুবই বুঝার বিষয়। আবার মাইকে পড়ার মধ্যে দ্বিগুণ গুনাহ হবে। কেননা ঐ সময় মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা সকলের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। অথচ শ্রবণ করা ওয়াজিব। সুতরাং শবিনা খতম নিঃসন্দেহে বিদয়াত সাইয়্যেয়া এবং মাকরুহে তাহরীমা বিধায় ইহা পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। এবং সামর্থ শক্তি অনুসারে প্রত্যেক দায়িত্ববান আলেমের জন্য এর প্রতিরোধ করা ওয়াজিব।

যেহেতু অধিকাংশ হাফেজই অন্ধ ও গায়বে আলেম বিধায় কুরআন হাদিস ও ইলমে ফিকাহ বুঝতে তারা সম্পূর্ণ অপারগ। টাকার লোভে তারা আখেরাতের ব্যাপারে আরো অন্ধ হয়ে যায়। তাকওয়া পরহেজগারীও তেমন থাকে না। অথচ ইসলামে সওয়াব হিসাবে খতমে শবিনা পড়ে পারিশ্রমিক নেয়া ও দেয়া উভয়ই হারাম। পবিত্র ক্বালামে তার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। "আমার কুরআন অল্প মূল্যে বিক্রি করিও না।"[১]

উক্ত আয়াত তেলওয়াত করে সঠিক অর্থ বুঝার ব্যাপারে অন্ধ। স্বল্প মূল্যের অর্থ তাফসীরে খাজেনে বলা হয়েছে, দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যাবতীয় সম্পদ। পবিত্র হাদিসে আছে "তোমরা বিনিময় ব্যতীত কুরআন তেলওয়াত কর।" ফতোয়ায়ে শামীতে আছে "দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই গুনাহগার হবে।"—৫নং খণ্ড ৪৫ পৃষ্ঠা।

খতমে শবিনা নাজায়েজ সম্পর্কে মুসলিম শরীফে আছে, "হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুজুর পাক (দঃ) একরাত্রে সমস্ত কুরআন তেলওয়াত করিয়াছেন এবং সমস্ত রাত্রি ব্যাপী নামায পড়িয়াছেন বলে আমার জানা নেই। রমযান ব্যতীত অন্য কোনো সময় পূর্ণ মাস রোযা রাখেন নাই।"

সত্যায়িত

মুফতিয়ে আজম ফায়েজ উল্লাহ সাহেব (রঃ)।

শবিনা খতমের ব্যাপারে এতক্ষণ যা বললাম, মুফতি মুঃ মাওলানা ইব্রাহিম খান রচিত "শরিয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার বই এর ১৭৫ পৃষ্ঠা থেকে ১৭৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।"

---

১ সূরা মায়েদাহ, ৩৪নং আয়াতের শেষের দিকের অংশ, পারা—৬।

আমাদের দেশে চাল্লিশা বা মৃত্যুবার্ষিকী বা মরহুম পিতা-মাতা ও মুরুব্বীদের নামে বছরে একবার যে ওরশ করে দো'য়া খায়ের করা হয়, এটারও অকাট্য দলিল নেই। আর তিন স্বর্ণযুগেও ছিল না। আপনারা শুনে অবাক হবেন, ভারত, বাংলাদেশে ও পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে মিলাদ শরীফ পড়ান ও এইসব জিনিসের প্রচলন নেই। এমন কি মক্কা-মদিনাতেও নেই। এখন চিন্তা করে দেখুন, আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত করে যেভাবে ধুমধামের সঙ্গে মৃত্যুবার্ষিকীর জন্য মিলাদ বা ওরশ ও দো'য়ার ব্যবস্থা আমরা যে করে থাকি, তা কি ঠিক? আর এরকম এতকিছু করার পিছনে যদি মান-সম্মানের উদ্দেশ্য জড়িত থাকে, তা হলে তো এই সব কিছু আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। আসলে মরহুম মুরুব্বীদের রুহের মাগফেরাতের জন্য যদি ছেলেমেয়েরা কিছু করতে চান, তা হলে বছরের যে কোনো দিন গরিব মিসকীনদের খাওয়াবেন, তাদেরকে জামাকাপড় দান করবেন, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ গরিব থাকলে তাদেরকে সবার আগে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করবেন। মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানায় দান করবেন অথবা গরিবদের উন্নতির জন্য উৎপাদনমূলক কোনো প্রতিষ্ঠান করে ওয়াকফ করে দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করার ব্যবস্থা করবেন। আর দিনে হোক বা রাতে হোক নির্জনে একাকী কেঁদে কেঁদে এই সমস্ত কাজের অসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে তাদের মাগফেরাতের দো'য়া করবেন। একটা কথা জেনে নিন, দো'য়া হল নফল ইবাদত। নফল ইবাদত দিনে হোক, রাতে হোক গোপনে করতে হয়। এই রকম জামায়াতবদ্ধ হয়ে লোক দেখান দো'য়া করার কোনো অকাট্য দলিল নেই। এমন কি ফরয নামাযের পর জামায়াতের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করারও কোনো অকাট্য দলিল নেই। এ সম্পর্কে মুফতি ইবরাহিম খাঁন রচিত "শরীয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার" বই-এর ১৪০ পৃষ্ঠার শেষ পরিচ্ছদ থেকে ১৪২ পৃষ্ঠার শেষ লাইনের উপর পর্যন্ত লেখা আছে, "আর জানা আবশ্যক, হাল জামানায় মানুষের মধ্যে ফরয নামাযের পর এক বিশেষ মোনাজাতের প্রচলন প্রসিদ্ধ। ইহাতে ইমাম মোক্তাদী সকলেই একসাথে হাত উত্তোলন করে এবং মোক্তাদীগণ আমিন আমিন বলতে থাকে। মোনাজাতের শেষ লগ্নে আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া আরহামার রাহেমীন বলে দো'য়া শেষ করে। এটাকে নামাযের মোনাজাত বলে। অনেক এলাকায় নামাযের পর মুসুল্লীগণ বসে থাকে, সুন্নত নামাযসমূহ শেষ হলে সকলে দো'য়ায় মশগুল হয়। ইহাকে আখেরী মোনাজাত বলে। অথচ এ জাতীয় দো'য়া হযরত নবী করিম (দঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন ও আম্বিয়ায়ে মুজতাহিদীনগণ থেকেও কোনো দলিল বা নজীর কিছুতেই পাওয়া যায় নি। এর সম্পর্কে সহিহ তো দূরের কথা, কোনো দুর্বল হাদিসও নেই। যা অনুসন্ধানকারীগণের নিকট গোপন নয়।

জানা দরকার যে, দো'য়া হল নফল কাজ এবং নফল আমলের ব্যাপারে শরীয়তভিত্তিক স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হল, একক ও গোপনভাবে করা। যৌথ ও প্রকাশ্যভাবে নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক নফল কাজ গোপনভাবে এবং একাকীভাবে করাই হল শরীয়তের দাবি ও হুকুম। জামায়াতবদ্ধভাবে ও প্রকাশ্যভাবে নয়।

মাজহাবে হানাফির সুপ্রসিদ্ধ ও একমাত্র নির্ভরযোগ্য কিতাব হিদায়ার মধ্যে আছে, দো'য়ার প্রকৃত নিয়ম হল গোপনীয়তা অবলম্বন করা; কিন্তু এস্তেসকার (বৃষ্টি বর্ষণ) ও কুসুফের (চন্দ্র গ্রহণ) নামাযের ব্যতিক্রম। এই দুটি নামায যদিও বা নফল, কিন্তু যেহেতু এ ব্যাপারে হাদিস শরীফে সম্মিলিত ও প্রকাশ্যে করার প্রমাণ রয়েছে। কাজেই উক্ত নামায জামায়াত ভিত্তিক প্রকাশ্যভাবে আদায় করতে হবে এবং এরপর দো'য়াও সম্মিলিতভাবে হাত উত্তোলন করে করতে হবে। কেননা নবীয়ে করিম (দঃ) থেকে এমনিভাবে করার প্রমাণ রয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য কোনো নফল ইবাদতের মধ্যে সম্মিলিত এবং প্রকাশ্যে করার নিয়ম নেই। বলাবাহুল্য যে, হুজুর (দঃ) এর নবুয়তী জিন্দেগীর তেইশ বছর পর্যন্ত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতীর কাজ নিজেই সম্পন্ন করেছেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যদি মুক্তাদীগণসহ একবারও ফরয নামাযের পর সম্মিলিতভাবে দো'য়া করতেন, (যা বর্তমানে করা হয়), তা হলে অবশ্যই সমস্ত বর্ণনাকারীগণ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করার প্রয়াস পেতেন। বর্তমানে দো'য়া প্রমাণ করার জন্য কিয়াসের প্রয়োজন হত না। কিন্তু সহিহ, দুর্বল তো দূরের কথা, একটা মউজ্জু (মনগড়া) দ্বারা বিশেষ আকারে প্রচলিত মোনাজাতের প্রমাণ যেমন হুজুর (দঃ) এর কাছ থেকে পাওয়া যাই নি, তেমনি সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবেয়িন (রঃ) আজমায়ে মুজতাহিদীগণের থেকেও তার কেশাগ্র পরিমাণও প্রমাণ নেই।

যে সমস্ত হযরাতে কেরামগণ উক্ত বিশেষ আকারে মোজানাত করাকে মুস্তাহাব বলেন, তাদের যুক্তিভিত্তিক দলিল হল, "তারা বলেন, রেওয়ায়েত আছে ফরয নামাযের পর দো'য়া কবুল হয় এবং কতক দো'য়ার মধ্যে হুজুর (দঃ) থেকে হাত উঠানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং বিশেষ আকারে এ দো'য়া ও মোনাজাত সুন্নত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দলিল ও যুক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে 'হাবায়াম মানসুরা' অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতো সম্পূর্ণ দুর্বল ও অসার বই কিছুই নয়। তাদের এই কিয়াসের শরীয়তের নিকট কোনো মূল্য নেই। এ সাধারণ জ্ঞানতো প্রায় সকলেরই আছে যে, যেখানে পরিষ্কারভাবে শরীয়তের দলিল বিদ্যমান ফরয নামাযের পর হুজুর পাক (দঃ) কি করেছেন, তা হরফে হরফে প্রতিটি অবস্থা বর্ণনা সুরক্ষিত। সেখানে অনুমানভিত্তিক অসার কিয়াসের কোনো মূল্য নেই, থাকতেও পারে না। যদি তা মেনে নেয়া হয়, তা হলে আর

দ্বীন থাকবে না। তওরাত, ইঞ্জিল, ইত্যাদির মতো দ্বীন বিকৃত হয়ে যাবে। বরং শরীয়তভিত্তিক স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হল, যতটুকু আমল করার প্রমাণ পাওয়া যায়, ততটুকুরই আনুগত্য করা। আর যার প্রমাণ নেই, তা পরিত্যাগ করা।

হুজুর পাক (দঃ) অন্ধকার রাত্রে গোপনীয়ভাবে কোথায় কি করেছেন, তাও অনুসন্ধান করে সাহাবাগণ (রাঃ) ভবিষ্যৎ উম্মতের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছেন। নবী করিম (দঃ) এর চাল-চলনের প্রতিটি অবস্থাই বর্ণনাকারীগণ অতি যত্নের সাথে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে প্রকাশ্যকৃত গুরুত্বপূর্ণ কাজের বর্ণনা থাকবে না, তা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবান্তর কথা।"

মোনাজাতের ব্যাপারে যা কিছু বললাম, তা মাওলানা মুফতি ইবরাহিম খান রচিত "শরীয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার বই থেকে।"

একটা কথা প্রতিটি মুসলমানের জেনে রাখা উচিত, যে কোনো কাজ বা প্রথার যদি অকাট্য দলিল না থাকে এবং এ জাতীয় নতুন কাজ বা প্রথা দ্বীনের হেফাজত বা নির্ভরশীল না হয়, আর সেটাকে ইবাদত বা সওয়াবের কাজ বলে মানুষ মনে করে, তা হলে এসব বেদায়াতে সাইয়্যেহা অর্থাৎ মাকরুহে তাহরীমা হবে। আরো একটা কথা জানা উচিত, ইসলামের সবকিছু পরিপূর্ণ করার কথা হযরত নবী করিম (দঃ) বিদায়ী হজ্বের নয় তারিখে শুক্রবার আরাফাতের ময়দানে লক্ষাধিক পবিত্র আত্মা তথা সাহাবাগণের (রাঃ) সম্মিলিত সমাবেশে আসরের পর আয়াতে করিমা অবতীর্ণের মাধ্যমে আল্লাহ পাক ঘোষণা করলেন—"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করিয়া দিলাম। আর আমি তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে ইমলামকেই পছন্দ করিলাম।"[১] হাদিসে আছে, "রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমাদের এই ধর্মে যাহা নাই এমন কোনো নতুন বিষয় যদি কেহ প্রবর্তন করে, সে অভিশপ্ত।"[২] হাদিসে আরো আছে, "রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা উত্তম বাণী আল্লাহর কুরআন এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম হেদায়েত (পথ প্রদর্শন) মুহাম্মদের হেদায়েত, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যাপার নব-বিধান এবং প্রত্যেক নব-বিধানই বেদায়াত (পথ-ভ্রষ্টকারী)।"[৩] এরপরও কি ইসলামে যার কোনো অকাট্য দলিল নেই, সেই সব নব-বিধান আমাদের মেনে চলা উচিত?

যাক, আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করলাম, সেজন্য মাফ চাইছি। আমার কথাগুলো যদি আপনাদের মনঃপূত না হয় অথবা বিশ্বাস না হয়, তা হলে কোনো হাক্কানী আলেম অথবা কোনো মুফতি সাহেবের কাছে থেকে জেনে নিতে

---

১ সূরা-মায়িদাহ, ৩নং আয়াতের শেষের দিকের অংশ, পারা—৬।

২ বর্ণনায় : হযরত আয়েশা (রাঃ)—বুখারী, মুসলিম।

৩ বর্ণনায় : হযরত যাবের (রাঃ)—মুসলিম।

পারেন। অথবা মুফতি মাওলানা ইবরাহিম খানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আর একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না, দেখলাম, অনেকে ক্ষীর (চালের পায়েস), জিলিপী ও বাতাসা শির্নী হিসাবে নিয়ে এসেছে। এগুলো যদি তারা মানত হিসাবে এনে থাকে, তা হলে আমাদের মধ্যে যারা সাহেবে নেসাবের অধিকারী, তাদের খাওয়া না জায়েজ হবে। শুধু যারা গরিব ও সাহেবে নেসাবের অধিকারী নন, তারা খেতে পারবেন। এখন প্রচলিত প্রথামতো দো'য়া না করে মাতব্বর সাহেবসহ আমরা প্রত্যেকে নিজে নিজে তাঁর মরহুম পিতার রুহের মাগফেরাতের জন্য দো'য়া করি আসুন বলে হাবিব ডাক্তার দু'হাত তুলে অনুচ্চস্বরে দো'য়া করতে লাগল।

হাবিব ডাক্তারকে গ্রামের সবাই, বিশেষ করে গরিব অশিক্ষিতরা পীরের মতো মনে করে। তাই তাকে দো'য়া করতে দেখে তারাও যখন হাত তুলে দো'য়া করতে লাগল, তখন অন্যরাও তাই করতে লাগল।

খাওয়া-দাওয়ার পর পারভেজকে নিয়ে মুশতাক বিশ্বাস আলাপ করার সময় হাবিব ডাক্তারকে বললেন, মসজিদে আপনার কথা শুনে অনেকে নানারকম কথা বলছে, অনেকে আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। যাক ওসব কথা, আপনাকে আসতে বলেছি একটা কথা বলব বলে। আপনি যদি মনে কিছু না করেন, তা হলে বলতে পারি।

মুশতাক বিশ্বাস এতদিনে তাকে তুমি সম্বোধন করে এসেছেন। আজ সকালেও বলেছেন। এখন আপনি করে বলতে শুনে হাবিব ডাক্তার বেশ অবাক হলেও তা প্রকাশ না করে বলল, আপনি মুরুব্বী মানুষ। এতদিন ছেলের মতো মনে করে আমাকে তুমি করে বলে এসেছেন, এখন আবার আপনি করে বলছেন কেন? তুমি করে বললে খুশি হব। আর আপনার কথা শুনে কিছু মনেই বা করব কেন? নিশ্চিন্তে বলুন।

হ্যাঁ বাবা, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। এতদিন তোমাকে ছেলের মতই দেখে এসেছি। তারপর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, আমার মেয়ে আতিকাকেতো খুব ভালো করেই চেনো। ওর জন্য অনেক পাত্র দেখেছি, কিন্তু উপযুক্ত কাউকেই পাই নি। এই এলাকায় আসার পর থেকে তোমার সবকিছু দেখে শুনে আমরা আতিকার জন্য তোমাকে পছন্দ করেছি। কথা শেষ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হাবিব ডাক্তার এই কথা শোনার জন্য অনেকদিন থেকে অপেক্ষা করছিলেন। তাই মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলল, আমার সম্পর্কে কতটুকু জেনেছেন জানি না, আমি কিন্তু বিবাহিত। আমাদের বংশ হল খাঁ। আমাদের বংশের নিয়ম হল, খাঁ বংশ ছাড়া অন্য বংশে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়া হয় না। আমি অবশ্য এই নিয়ম মানি না। তাই অন্য বংশে বিয়ে করেছি।

তার কথা শুনে মুশতাক বিশ্বাস অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু আমরা তো জেনেছি তুমি এখনো বিয়ে কর নি? তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমিও তো একদিন তাই বলেছিলে?

পারভেজ কিছু বলার আগে হাবিব ডাক্তার বলল, আপনারা ঠিক কথাই শুনেছিলেন। মাত্র চার-পাঁচ মাস আগে যে বিয়ে করেছি। তাই এখানকার কেউ এখনো জানে না।

মুশতাক বিশ্বাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আল্লাহ যার সঙ্গে যার জোড়া করেছেন, তার সঙ্গেই তার বিয়ে হয়। তা বাবা, তোমার বাড়ি তো ঢাকায়, সেখানে তোমার জানাশোনা কোনো ভালো ছেলে থাকলে আতিকার জন্য একটু চেষ্টা করে দেখ না। দরকার মনে করলে ওর কয়েকটা ফটো তোমাকে দেব।

ওসবের দরকার নেই। আমি আতিকাকে বোনের মতো মনে করি, তাই আগে থেকে ওর জন্য আপনাদের গ্রামেরই একটা ছেলেকে পছন্দ করে রেখেছি।

মুশতাক বিশ্বাস বেশ অবাক হলেও গম্ভীর স্বরে বললেন, ছেলেটা কে?

খাঁপাড়ার নাদের আলি। বেশি লেখাপড়া না করলেও খুব ভালো ছেলে। রুগী দেখতে আশপাশের সব গ্রামেই গেছি, নাদের আলির মতো এত ভালো ছেলে আর দেখি নি। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি.....।

মুশতাক বিশ্বাস হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে খুব রাগের সঙ্গে বললেন, কী বলছ তুমি ডাক্তার? ঐ ছোটলোকের বাচ্চার কথা আর মুখে আনবে না। দাঁওমতো পেলে ওকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেব।

তার রাগের কারণ হাবিব ডাক্তার জানে। তাই ভনিতা করে বলল, নাদের আলিকে ছোটলোকের বাচ্চা বলছেন কেন? আমি তো জানি খাঁয়েরা খুব খান্দানী বংশ। আগে আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল। এখন না হয় গরিব হয়ে গেছে।

মুশতাক বিশ্বাস এবার খুব বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, তুমি মাত্র এক দেড় দু'বছর হল এই এলাকায় এসেছ। খাঁয়েদের সম্পর্কে আর কতটুকু জেনেছ? খাঁ বংশটাই ছোটলোক।

কিন্তু আমি তো তাদের কোনো ছোটলোকী কাজ কারবার দেখি নি। যদি তারা সে রকম হত, তা হলে নিশ্চয় কিছু না কিছু বুঝতে পারতাম।

মুশতাক বিশ্বাস গরম মেজাজে বললেন, ওদের কথা আর বলো না। যা জান না, তা নিয়ে কথা বলতে চাই না। শুধু একটা ব্যাপার বলছি, পূর্বপুরুষ থেকে খাঁয়েদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা। আর বিশ্বাস গুষ্টি ছাড়া আমরা অন্য গুষ্টির সঙ্গে আত্মীয়তা করি না।

হাবিব ডাক্তার বললেন, বেয়াদবি নেবেন না, এ ব্যাপারে আমি দু'একটা কথা বলতে চাই। অবশ্য আপনি যদি অনুমতি দেন।

মুশতাক বিশ্বাস অসন্তুষ্টকণ্ঠে বললেন, বল কী বলতে চাও।

পূর্বপুরুষ থেকে খাঁয়েদের সঙ্গে আপনাদের শত্রুতার কারণ আমি জানতে চাই না। তবে এখনও সেই শত্রুতা জিইয়ে রাখা কোনো পক্ষেরই উচিত হয় নি। কারণ, কুরআনে আল্লাহ বলিয়াছেন, "এক মুমীন অন্য মুমীনের ভাই।" আর হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, "এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। তাহাকে সে অত্যাচার করে না, অপমান করে না। এবং (বুকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) এইস্থানে অবস্থিত তাহার ধর্মভীরুতাকে অবজ্ঞা করে না। মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করার জন্য যে পাপ হয়, উহার বিবেচনায় তিনি তিনবার স্বীয় বুকের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। তাহার জান-মাল এবং তাহার সমান।"[১] তিনি আরো বলেছেন, "তিনদিনের অতিরিক্ত কোনো মুসলমানের পক্ষে তাহার ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকা হালাল নহে। যে তিন দিবসের অতিরিক্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে অতঃপর তাহার মৃত্যু হয়, সে দোযখে যাইবে।"[২] হাদিসে আরো আছে, রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেস্তের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। তখন শিরক (অংশীবাদী) ভিন্ন প্রত্যেক লোককে ক্ষমা করা হয়। যে দুইজনের মধ্যে বিবাদ থাকে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা হয় না। উহাদিগকে বলা হয়, যে পর্যন্ত মীমাংসা না কর, সেই পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"[৩]

শুনুন মাতব্বর সাহেব মুমীন মুসলমান হয়ে শুধু খাঁয়েদের সঙ্গেই নয়, যে কোনো মানুষের সঙ্গে শত্রুতা থাকলে মিটিয়ে ফেলুন। নচেৎ কি হবে, তাতো কুরআন হাদিসের বাণীতে শুনলেন। আপনি হজ্বও করেছেন, বয়সও হয়েছে। পূর্ব পুরুষরা খাঁয়েদের সঙ্গে যে শত্রুতার বীজ বপণ করে গেছেন, তা মিটিয়ে ফেললে, আপনার ও আপনার ভবিষ্যৎ বংশধরদের ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল হবে। এবং মরহুম পূর্বপুরুষদেরকেও আল্লাহ্ আপনার অসিলায় নাযাত দিতে পারেন।

কুরআন-হাদিসের বাণী শুনে মুশতাক বিশ্বাসের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হলেও বংশ মর্যাদার কথা ভুলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, বিশ্বাসদের মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তির তুলনায় খাঁয়েরা অনেক ছোট। তুমিই বল, তাদের সঙ্গে কী আমরা আত্মীয়তা করতে পারি? নাদের আলির না আছে বংশ মর্যাদা, না আছে ধন-সম্পদ, কি দেখে তাকে আমরা জামাই করব। তুমি তো আমাদের অবস্থার কথা জান। আতিকা কত সুখে মানুষ হয়েছে। আমাদের ঐ একটাই মেয়ে। নাদের আলি কি তাকে সেইভাবে রাখতে পারবে? তা ছাড়া আমি গ্রামের পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাব কি করে?

---

১ বর্ণনায় হযরত আবু হোরাইয়া (রাঃ)—মুসলিম।

২ বর্ণনায় হযরত আবু হোরাইয়া (রাঃ)—আহম্মদ, আবু দাউদ।

৩ বর্ণনায় হযরত আবু হোরাইয়া (রাঃ)—মুসলিম।

হাবিব ডাক্তর বলল, আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন। ইসলামেও কুফু অর্থাৎ সমপর্যায়ে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে বলা হয়েছে। তবে কুফুর ব্যাখ্যা অনেক। সে সব বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। তাই অল্পকিছু আলোচনা করছি। বিয়ের ব্যাপারে ছেলে বা মেয়ের বংশ ভালো না মন্দ অবশ্যই দেখতে হবে। যদি কোনো বংশের সমাজিক ও পারিবারিক জীবনে ধর্মের অনুশীলন থাকে, ছেলে বা মেয়ে ধার্মিক হয়, হালাল হারাম বেছে চলে এবং আর্থিক অবস্থা খুব ভালো না হলেও মোটামুটি স্বচ্ছল, তা হলে তারা কুফুর অন্তর্গত। সেখানে বংশ মর্যদার কথা চিন্তা না করে ইসলাম আত্মীয়তা করতে বলেছে। সেক্ষেত্রে বংশের গৌরব খাটে না। নাদের আলির অনেক ধন-সম্পদ না থাকলেও তার কোনো অভাব নেই। ইদানিং জমি-জয়গা করেছে, নতুন বাড়ি করেছে। তা ছাড়া তার বাপ-চাচারা যথাসম্ভব ধর্ম কর্ম মেনে চলেন। সুদের ব্যবসা করেন না, মদ-তাড়ি খান না, তা নিশ্চয় আপনি জানেন।

মুশতাক বিশ্বাস দৃঢ়স্বরে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। তবু নাদের আলির সঙ্গে আতিকার বিয়ে হবে না, হতে পারে না।

আপনি জানেন কিনা জানি না, ওরা কিন্তু স্কুলে পড়ার সময় থেকে একে অপরকে পছন্দ করে। কথাটা শেষ করে মুশতাক বিশ্বাসের মুখের দিকে হাবিব ডাক্তার তাকিয়ে রইল চেহারার কোনো পরিবর্তন হয় কিনা দেখার জন্য।

মুশতাক বিশ্বাসের মুখে রাগের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে হাবিব ডাক্তার আবার বলল, আপনাদের পারিবারিক ব্যাপারের কথা বলে বোধ হয় আমি ভুল করে ফেললাম, মাফ করে দিন।

পারভেজ এতক্ষণ চুপ করে সবকিছু শুনছিল। কুরআন-হাদিসের বাণী শুনে তার মনও নরম হয়েছিল। পছন্দ করার কথা শুনে খুব রেগে গেল। রাগের সঙ্গে বলল, একথা বিশ্বাস করি না। আতিকা আমার বোন। তাকে আমার থেকে কেউ বেশি জানে না। সে কিছুতেই নাদের আলিরমতো একটা, হা-ভাতে ছেলেকে পছন্দ করতে পারে না।

হাবিব ডাক্তার তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, পারভেজ ভাই, মনে হচ্ছে আপনি আমার কথা শুনে খুব রেগে গেছেন। কথাটা বিশ্বাস না হলে, আপনার স্ত্রীকে দিয়ে আতিকার কাছ থেকে সত্য মিথ্যা জানতে পারবেন। তারপর মুশতাক বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে বলল, একটু আগে বললাম না, আতিকাকে আমি বোনের মতো মনে করি? তাই তাদের সম্পর্কের কথা জানতে পেরে নাদের আলির সবকিছু খোঁজ খবর নিই। একমাত্র আর্থিক দিক ছাড়া অন্য সবকিছুতে আতিকার উপযুক্ত। আপনার এক ছেলে এক মেয়ে। আপনি মারা যাওয়ার পর আতিকা অনেক সম্পত্তি পাবে। ইচ্ছা করলে বিয়ের সময় তাকে তার অংশ দিয়ে

দিতে পারেন। তা হলে নাদের আলি গ্রামের ধনীদের একজন হয়ে যাবে। এতে করে আপনার সুনামও বাড়বে। ওদের কথাটা অনেকদিন থেকে আপনাকে জানাব ভেবেছিলাম, সময় সুযোগের অভাবে জানাতে পারি নি। আজ আপনি আতিকার বিয়ের কথা তুলতে বললাম। এখন আপনাদের মর্জি। এবার যাওয়ার অনুমতি দিন বলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মুশতাক বিশ্বাস গম্ভীরস্বরে বললেন, একটা কথার উত্তর দিয়ে যাও।

বেশ তো বলুন।

গত বন্যায় নাদের আলি পথের ভিখারী হয়ে গিয়েছিল, এই একদেড় বছরের মধ্যে কি করে এত উন্নতি হল বলতে পার?

হাবিব ডাক্তার মৃদু হেসে বলল, তা আমি কি করে বলব? সে তো এই গ্রামের ছেলে। আপনাদেরই তো জানার কথা। তবে এতটুকু বলতে পারি, সবই আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি মুহূর্তে আমীরকে ফকির ও ফকিরকে আমীর করতে পারেন।

মুশতাক বিশ্বাস একইস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ওদের দু'জনের পছন্দের কথা তুমি জানলে কী করে? নিশ্চয় নাদের আলি বলেছে?

আমাকে বলার মতো সাহস নাদের আলির নেই। কে বলেছে জানতে চাচ্ছেন কেন? তারা যে এখনো দেখা সাক্ষাৎ করে, তা শুধু আমিই নই, গ্রামের অনেকেই জানে। সাহস করে কেউ আপনাকে জানাতে পারে নি। তাই বলছিলাম, কথাটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ার আগে ওদের বিয়ে দিয়ে দিলে চাপা পড়ে যেত। আপনাদের মান-সম্মানেরও হানি হত না। তারপর আসি বলে সালাম বিনিময় করে হাবিব ডাক্তার চলে গেল।

আতিকা ও নাদের আলির সম্পর্কের কথা শোনার পর থেকে পারভেজ রেগে রয়েছে। হাবিব ডাক্তার চলে যাওয়ার পর রাগের সঙ্গে আব্বাকে বলল, আপনি নাদের আলির সঙ্গে আতিকার সম্পর্কের কথা জানতেন?

ছেলে খুব রেগে আছে মুশতাক বিশ্বাস বুঝতে পেরে বললেন, মাথা গরম করবে না। যা করার চিন্তা ভাবনা করে করতে হবে।

তা না হয় করা যাবে? ওদের সম্পর্কের কথা জানতেন কিনা বলুন।

আগে জানতাম না, কিছুদিন আগে বইরাপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার মিটিং সেরে ফেরার সময় মাঝপাড়ার রশিদ শেখের পুকুরপাড়ে আতিকাকে নাদের আলির সঙ্গে কথা বলতে দেখি। সঙ্গে গিয়াস ছিল, সেও তাদেরকে দেখেছে। ঐদিনই গিয়াসকে তার লোকজন নিয়ে গভীর রাতে নাদের আলির হাত-পা ভেঙ্গে দিতে বলি। গিয়াস লোকজন নিয়ে গিয়েছিল, তারপর যা ঘটেছে বললেন।

আব্বার কথা শুনে পারভেজের রাগ পড়ল। বলল, নাদের আলির বাস্তুতে জিন থাকে, কই, আমি তো কখনো শুনি নি?

তুমি তো সেদিনের ছেলে, আমিই কোনো দিন শুনি নি। এখন ওসব কথা বাদ দাও। আমি চিন্তা করছি, হাবিব ডাক্তারের কথা। সে কেন নাদের আলির সঙ্গে আতিকার বিয়ে দেয়ার এত আগ্রহী?

পারভেজ বলল, উনি মহৎ লোক, হয়তো বিয়ের মাধ্যমে দু'বংশের শত্রুতা মিটিয়ে দিতে চান।

মনে হচ্ছে তোমার কথা ঠিক। তবু আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে, তার আরো কোনো উদ্দেশ্য আছে।

আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। আর যদি থেকেও থাকে, তা হলে ভালো ছাড়া মন্দ হতে পারে না। কেননা ওঁর মতো ছেলে কারো ক্ষতি করতে পারেন না। তবে নাদের আলির সঙ্গে আতিকার বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না।

তাতো নিশ্চয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভালো ছেলে দেখে আতিকার বিয়ে দিতে হবে। আমার আর একটা ব্যাপার সন্দেহ হচ্ছে, নাদের আলির উন্নতির পিছনে হাবিব ডাক্তারের হাত আছে।

আপনার এরকম মনে হল কেন?

তা না হলে হঠাৎ করে নাদের আলি এত টাকা-পয়সা পেল কোথায় যে, এই দেড় বছরের মধ্যে এতকিছু করে ফেলল। গ্রামে এমন কেউ কি আছে, যে নাকি তাকে শুধু শুধু টাকা-পয়সা দেবে? আল্লাহ ইচ্ছা করলে যাকে ইচ্ছা ধনী-গরিব করতে পারেন ঠিক, তবে তিনি তা কারো দ্বারা করিয়ে থাকেন। এবার আমার সন্দেহের কারণটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ?

জি পেরেছি।

তা হলে এক কাজ কর, হাবিব ডাক্তারের সঙ্গে তোমার তো খুব জানাশোনা, বুদ্ধি করে তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা কর।

পারভেজ বলল, ঠিক আছে আব্বা, তাই জানার চেষ্টা করব।

সাত

হাবিব ডাক্তার একদিন চেয়ারম্যান আজিজুর রহমানের পাঁচ বছরের পোতা হাবিবুর রহমানকে দেখতে কাঁটাবাগান পাড়ায় গেল। দু'দিন থেকে একশ চার জ্বর। মাথায় পানি ঢেলেও জ্বর কমে নি। জ্বরের ঘোরে চোখ খুলতে পারে না। কোনো কিছু খায়ও না। রুগীকে পরীক্ষা করে হাবিব ডাক্তার বলল, ভয়ের কিছু নেই। ইনশাআল্লাহ জ্বর কমে যাবে। তারপর একগ্লাস পানি আনতে বলল।

চেয়ারম্যান নিজেই এক গ্লাস পানি নিয়ে এলেন।

হাবিব ডাক্তার কিছু পড়ে রুগীর গায়ে ফুঁক দিল। তারপর আরো কিছু পড়ে গ্লাসের পানিতে ফুঁক দিয়ে রুগীকে দু'তিন চামচে খাইয়ে ডান হাতের তালুতে অল্প একটু পানি নিয়ে রুগীর গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বলল, আজ আর কোনো ওষুধ দেব না। রাতের মধ্যে যদি জ্বর না কমে, তবে সকালে কাউকে আমার কাছে পাঠাবেন।

হাবিব ডাক্তার যে ঝাড়ফুঁক ও পানি পড়া দিয়ে অনেক রুগী ভালো করেছে, তা চেয়ারম্যান শুনেছেন। তাই অবাক না হয়ে বললেন, মেডিক্যাল সাইন্সেতো এসব বিশ্বাস করে না। তবু আপনি করেন কেন?

হাবিব ডাক্তার মৃদু হেসে বলল, শুধু মেডিক্যাল সাইন্স নয়, সাইন্সের কোনো থিওরিই পারমানেন্টও নয়, সঠিকও নয়।

এমন সময় চেয়ারম্যানের বড় ছেলে হামিদুর রহমান এসে বলল, আব্বা, বারান্দায় চা দেয়া হয়েছে।

চেয়ারম্যান বললেন, চলুন ডাক্তার, আমরা বারান্দায় গিয়ে বসে একটু চা খাই।

চা খাওয়ার সময় চেয়ারম্যান বললেন, জ্বর কমার জন্য কিছু ওষুধ দিলে হত না?

হাবিব ডাক্তার সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, আপনার এই পোতাকে একটু সাবধানে রাখবেন। দুপুরে ও সন্ধ্যার সময় একা একা ঘরের বাইরে যেন না যায়, সবাইকে একটু খেয়াল রাখতে বলবেন। মনে হচ্ছে ওকে বাতাস লেগেছে। তাই আল্লাহর কালাম থেকে কিছু পড়ে ফুঁক দিলাম। আমার অনুমান সত্য হলে কিছুক্ষণের মধ্যে ইনশাআল্লাহ জ্বর কমবে। জ্বর কমার পর খেতে চাইবে। আর যদি তা না হয়, তা হলে তো কাল সকালে খবর দিতেই বললাম।

চেয়ারম্যান প্রসঙ্গ পাল্টালেন। বললেন, বইরাপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হাফেজ ও মুফতি। সেদিন জুম্মার নামাযের পর আপনি যেসব কথা বলেছিলেন, একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, আপনি ঠিক কথা বলেছেন। আমি বললাম, তা হলে আপনারা ঐসব করেন কেন? আপনারা এসবের প্রতিবাদই বা করেন না কেন? বললেন, অনেক আগে থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে অনেক ওলামায়ে কেরাম ও বোজর্গানেদ্বীন এই সব করে আসছেন। এর শিকড় এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে, তা উৎপাটন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেউ যদি এসবের প্রতিবাদ করে, তা হলে ফিতনার সৃষ্টি হবে। বর্তমানে যাঁরা বড় বড় আলেম, মুফতি ও বোজর্গানেদ্বীন আছেন, তাঁরা যদি এসব প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, তা হলে ফিতনার সৃষ্টি হলেও বিস্তৃতভাবে কিছু হবে না

এবং এসব কুসংস্কার সমাজ থেকে বিদূরিত হয়ে যাবে। আমাদের মতো ছোটখাটো আলেম বা মুফতিরা প্রতিবাদ করলে, সমাজে দলাদলির সৃষ্টি হবে। তাই জেনেশুনে আমাদের এইসব করতে হচ্ছে।

হাবিব ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ উনি অবশ্য ঠিক কথাই বলেছেন। তবে অনেক বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ও মুফতিগণ অনেক আগে থেকে এসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বহু কিতাব লিখেছেন। তাদের মধ্যে বিংশ শতাব্দির মুজাহেদ হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবী (রঃ) ইসলাহুর রুসুম (কুসংস্কার সংশোধন) কিতাবে তিনি ইসলামে ঢুকে পড়া বহু কুসংস্কারের কথা উল্লেখ করে তার সংশোধনের পথও বাতলে দিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল, সে সব শুধু কিতাবেই রয়ে গেছে। মুসলমানদের ঈমান ও তাকওয়ার দুর্বলতার কারণে সমাজে বাস্তবায়ন হয় নি। বর্তমানে চট্টগ্রামের মেখল হামিউস সুন্নাহ মাদ্রাসার খাদেম মুফতি মুঃ ইবরাহীম খান কৃত "শরীয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার" ও কুমিল্লার মুফতি মুঃ মুহিবউদ্দিন (ফয়েজী) কৃত "শরয়ী মানদণ্ডে ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত" বই দু'টির মধ্যে অকাট্য দলিলসহ এইসব কুসংস্কারের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। উক্ত বই দুটির বহুল প্রচার আমি কামনা করি। এই বই দুটি আমাদের দেশের প্রত্যেক মুসলমানের পড়া একান্ত কর্তব্য। আপনি জানেন কিনা জানি না, বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চট্টগ্রাম হাটহাজারীর জামিয়ে আহলিয়া মাদ্রাসা মসজিদসহ আরো কয়েকটা মসজিদে ও খুলনায় বিখ্যাত দারুল উলুম মাদ্রাসা মসজিদসহ আরো কয়েকটা মসজিদে এবং ইদানিং ঢাকায় কাঁটাবন মসজিদে ফরয নামাযের পর জামায়েতের সঙ্গে মোনাজাত করা হয় না।

এমন সময় চেয়ারম্যানের ছেলে হামিদুর রহমান এসে বলল, ঘাম দিয়ে হাবিবুর রহমানের জ্বর কমতে শুরু করেছে।

হাবিব ডাক্তার আলহামদুলিল্লাহ বলে বলল, আর কোনো চিন্তা নেই। ওকে বাতাসই লেগেছিল। শুনলে অবাক হবেন, আমার বড় ভাইয়ের তিন ছেলে। ছোট ছেলে সেদিন দুপুরে বা সন্ধ্যেয় একা একা বাসার পিছনের গলিতে বা ছাদে কোনো কারণে যায়, যেদিনই তাকে বাতাস লেগে জ্বর হয়। আবার দুষ্টুমি করলে কেউ যদি বকাবকি করে বা দু'একটা চড়-চাপড় মারে, তা হলেও তার জ্বর হবে। আব্বা আল্লাহর কালাম পড়ে ফুঁক দিলে ভালো হয়ে যায়। এজন্য তাকে কেউ বকাবকি বা মারধর করে না। আপনার এই পোতাকেও দেখছি তার মতো। এবার তা হলে আসি?

চেয়ারম্যান বললেন, আরো কিছুক্ষণ বসুন। দু'একটা কথা আলাপ করব। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

হাবিব ডাক্তার বলল, আপত্তির কি আছে? কি আলাপ করতে চান বলুন।

আপনার সম্পর্কে ভালো মন্দ কথা অনেক কানে পড়ে। তাই খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি, আপনি ঢাকার খুব ধনী ও মানিগুণী লোকের ছেলে। ডাক্তারি পাশ করে বিদেশ থেকে উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন। তবু এই পাড়াগাঁয়ে এসেছেন কেন?

হাবিব ডাক্তার চিন্তা করল, আজরাফ স্যার ইনাকে কিছু বলেন নি তো? ওঁর মতো লোকও নিষেধ করা সত্ত্বেও কথাটা গোপন রাখতে পারলেন না?

তাকে চিন্তা করতে দেখে চেয়ারম্যান আবার বললেন, আপনার মৌনতাই কিন্তু বলে দিচ্ছে, এখানে আসার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে?

আপনাকে কেউ কি আমার সম্পর্কে কিছু বলেছেন?

না, আমি নিজে খোঁজ-খবর নিয়েছি।

এখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা যে বললেন, তার খোঁজ নেন নি?

চেয়ারম্যান বুঝতে পারলেন, হাবিব ডাক্তার খুব বুদ্ধিমান। বললেন, খোঁজ যে নিই নি তা নয়, তবে সফল হতে পারি নি। তাই তো জিজ্ঞেস করলাম।

আজরাফ স্যারকে যা কিছু বলেছিল, হাবিব ডাক্তার সে সব বলে বলল। একটা অনুরোধ করছি, উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত এসব কথা গোপন রাখবেন।

চেয়ারম্যান মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, এতদিনে সফলতার পথে অগ্রসর হতে পেরেছেন?

জি, চার ভাগের তিন ভাগ পথ অতিক্রম করেছি, তারপর নাদের আলি ও আতিকার বিয়ের সম্বন্ধে মুশতাক বিশ্বাসের সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছে বলল।

আপনি কী মনে করেন, পূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারবেন?

আল্লাহ ভরসা। তিনি বান্দাদের মনের নেক মাকসুদ পূরণ করে থাকেন।

তা আমিও জানি। কিন্তু আপনি তো প্রতিশোধ নিতে ও দাদার সম্পত্তি উদ্ধার করতে এসেছেন? এটাকে নেক মাকসুদ বলছেন কেন?

দু'টোই শরীয়ত সম্মত। তা ছাড়া দাদাজীর কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিই, বিবাদমান দু'দল মুসলমানদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করব। আপনিই বলুন না, এসব করা কি ন্যায় না অন্যায়?

আপনার উদ্দেশ্য শুধু ন্যায়ই নই মহৎও। প্রয়োজনে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

হাবিব ডাক্তার মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলল, শুনে খুশি হলাম। সাহায্যের প্রয়োজন হলে জানাব। এখন শুধু দো'য়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে সফলতা দান করেন। এবার আমি একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

বেশ তো বলুন।

আমি বইরাপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার পাশে এমন একটা মাদ্রাসা করতে চাই, যেখানে হাফেজিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা হাফেজ হওয়ার পর হাদিস কিতাব পড়ে পাক্কা ঈমানওয়ালা বড় বড় আলেম ও মুফতি হয়ে ইসলামে যে সমস্ত বেদায়াত (কুসংস্কার) প্রবেশ করেছে, সেসব দূর করতে পারেন। তাদের অনেকে এখানকার লেখাপড়া শেষ করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (দঃ) এর বিধান মতো দেশ শাসন করতে পারেন। যারা বর্তমানে দেশের প্রশাসন বিভাগে আছেন, তারা আল্লাহর ও তাঁর রাসুল (দঃ) এর বিধান সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ এবং তারা এইসব বিধান মেনে চলে মানুষও হন নি। তাই তারা মানুষের তৈরি বিধানমতো দেশ শাসন করছেন। ধর্মে বিশ্বাস রেখে ও ধর্মের বিধানমতো যারা নিজেদেরকে পরিচালিত করেন এবং অন্যদেরকেও ধর্মের পথে পরিচালনা করার চেষ্টা করেন, তারাই মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর ধর্মকে পরিত্যাগ করে কোনো মানুষই চরিত্রবান হতে পারে না। শুধু কিছু আনুষ্ঠানিকতার নাম ইসলাম নয়। ইসলাম এমন একটা ধর্ম, যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ যা কিছু করবে আল্লাহ তার বিধান দিয়ে দিয়েছেন। সেই বিধানমতো করলে করণীয় সবকিছুই ইবাদত বলে গণ্য হবে। তাই যারা বলে ধর্মে রাজনীতি নেই, তারা ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। সারা বিশ্বের মানুষের জানা উচিত কোনো আইন প্রয়োগ করে বিশ্ব থেকে অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি, সন্ত্রাসী, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ বন্ধ সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হত, তা হলে উন্নতশীল দেশগুলোতে সবকিছু নির্মূল হয়ে যেত। কিন্তু হয়েছে কি? হয় নি। এসব নির্মূল করার একমাত্র হাতিয়ার ধর্ম। মানুষের যদি ধর্মের প্রতি বিশ্বাস থাকে, তবে মৃত্যু, কবর, হাশর ও জাহান্নাম ও বেহেস্ত সম্পর্কে জ্ঞান পাওয়ার পর কেউ-ই অন্যায়ের পথে পা বাড়াতে সাহস করত না। তবে শয়তানের অনুসারীরা কিছু থাকবেই। তারা আদিমকালেও ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু বর্তমানের মতো মহামারি আকারে অন্যায়, অত্যাচার, খুন, চুরি, ডাকাতি, দুর্নীতি, সন্ত্রাসী, ধর্ষণ দেখা দিত না। শুধু ধর্মের জ্ঞান থাকলে হবে না। জ্ঞানের অনুশীলন ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে, সমাজে, দেশে তথা সারা পৃথিবীতে থাকতে হবে। তা হলে দেশের তথা সারা পৃথিবীর মানুষ ইহকালে যেমন সুখ শান্তিতে বসবাস করতে পারত, তেমনি পরকালের অনন্তকাল জীবনেও বেহেস্তে সুখ-শান্তিতে থাকতে পারবে। আর একটা জিনিস, শিক্ষাঙ্গনই হচ্ছে ধার্মিক ও চরিত্রবান গড়ার কারখানা। তাই শিক্ষকদের ধার্মিক ও চরিত্রবান হওয়া অপরিহার্য। বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে, দুঃখে চোখে পানি আসে। তাই আমি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

করতে চাই, তার শিক্ষকমণ্ডলীকে হতে হবে সৎ ধার্মিক ও চরিত্রবান। এটা প্রতিষ্ঠিত করতে যত টাকার প্রয়োজন হবে, ইনশাআল্লাহ আমি দেব। আর আল্লাহ যদি দাদাজীর ওয়ারিশী সম্পত্তি পাইয়ে দেন, তা হলে সবটাই ঐ মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য ওয়াকফ করে দেব।

চেয়ারম্যান হাবিব ডাক্তারের গুণের কথা আগেই শুনেছেন, এখন তার মহৎ উদ্দেশ্যের কথা শুনে ভীষণ আনন্দিত হলেন। বললেন, কারো সামনে তার প্রশংসা করতে নেই জানা সত্ত্বেও না বলে পারছি না, "আপনার মতো একজন বিলেত ফেরত ডাক্তারকে ইসলামের অবক্ষয় রোধের পথে সংগ্রাম করতে দেখে যেমন অবাক হয়েছি, তেমনি আনন্দে বুকটা ভরে গেছে। আল্লাহ আপনার সমস্ত নেক কামনা-বাসনা পূরণ করুক। আপনাকে ইহকালে ও পরকালে সফলতা দান করুক। কথা দিচ্ছি, শুধু আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়, মাদ্রাসার ব্যাপারেও ইনশাআল্লাহ সাহায্য করব।"

সুবহান আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বলে হাবিব ডাক্তার বলল, আল্লাহ আপনারও ইহকালে ও পরকালে সফলতা দান করুক।

আচ্ছা, যা কিছু বললেন, এসব এখানকার আর কারো সঙ্গে আলাপ করেছেন নাকি?

হাবিব ডাক্তার অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, পশ্চিমপাড়ার আজরাফ স্যারকে এখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা বলেছি। তবে মাদ্রাসার ব্যাপারে কিছু বলি নি।

উনি শুনে কি বললেন?

আপনার মতো একই কথা বলেছেন।

আর একটা কথা, গ্রামের দু'একজন আমাকে জানিয়েছে, আপনি পশ্চিমপাড়ার হাশেম আলির বাড়িতে যান। মাঝে মাঝে রাতেও থাকেন। কথাটা কী সত্য? তারা আপনাকে খুব ভক্তি সম্মান করে। তাই আর কারো কাছে না বলে আমার কাছে বলেছে।

জি, তাদের কথা সত্য।

শুনেছি, আপনি চিকিৎসা করে হাশেম আলিকে সুস্থ করেছেন। সেটা খুব ভালো কথা; কিন্তু তার বাড়িতে ঘনঘন যান, রাতও কাটান, এটা কী ভালো? এসব জিনিস বেশি দিন গোপন থাকে না। অন্যরা জেনে গেলে আপনার মান সম্মান থাকবে? অবশ্য তার একটা বিধবা যুবতী মেয়ে না থাকলে কেউ কোনো কথা বলতে পারত না।

যীনাতকে বিয়ে করেছে, কথাটা এখনই চেয়ারম্যানকে বলবে কিনা হাবিব ডাক্তার চিন্তা করতে লাগল।

তাই দেখে চেয়ারম্যান বললেন, আমি অবশ্য মানুষের কথায় কান দিই না। হাশেম আলির একটা বিধবা যুবতী মেয়ে আছে, তাই হয়তো মানুষজন কথাটা আমাকে জানিয়েছে। আপনার মতো মানুষের নামে কোনো অপবাদ রটুক, তা আমি চাই না। তাই জিজ্ঞেস করলাম।

আমি হাশেম আলির মেয়েকে কয়েকমাস আগে বিয়ে করেছি, কথাটা হাশেম আলি তার এক চাচাত ভাইপো, আজরাফ স্যার ও তার স্ত্রী, আর যিনি বিয়ে পড়িয়েছেন, এই পাঁচজন ছাড়া কেউ জানে না। আমার উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলেছি।

চেয়ারম্যান সাহেব সুবহান আল্লাহ্, বলে হাসি মুখে বললেন, আমি এরকমই কিছু অনুমান করেছিলাম। মেয়েটার নাম যেন কী?

যীনাত বেগম।

হ্যাঁ হ্যাঁ, যীনাত। ও যখন স্কুলে পড়ত তখন থেকে চিনি। খুব গুণবতী ও ধার্মিক মেয়ে। ওর মাও খুব ধার্মিক ছিল শুনেছি। হাশেম আলিও খুব ধার্মিক ও সৎ। কিন্তু আল্লাহর কি কুদরত মেয়েটার দু'বার বিয়ে হল, দু'টো স্বামীই বিয়ের রাতে মারা গেল। তাই মেয়েটাকে কেউ দেখতে পারে না, সবাই অপয়া বলে। হাশেম আলি মেয়ের চিন্তায়ই পঙ্গু হয়ে গেল। এসব কথা কী বিয়ের আগেই জেনেছিলেন?

জি, আজরাফ স্যারের স্ত্রীর অসুখের সময় চিকিৎসা করতে গিয়ে যীনাতকে দেখে আমার পছন্দ হয়। তারপর আজরাফ স্যারের কাছেই তাদের সবকিছু শুনে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রস্তাব দিই।

আচ্ছা, আপনি যে এখানে এসে যা কিছু করছেন ও বিয়ে করেছেন, এসব আপনার মা-বাবা বা ভাইয়েরা জানেন?

জি, জানেন। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই সবকিছু করছি। আপনি বইরাপাড়ার হাফেজিয়া মাদ্রাসার পাশে অথবা কাছাকাছি নতুন মাদ্রাসার জন্য জমি দেখুন।

তা দেখব, তবে আপনি এ ব্যাপারে আজরাফ হোসেনের সঙ্গে কথা বলে দেখুন উনি কি বলেন। আর একটা কথা, বইরাপাড়ার হাফেজিয়া মাদ্রাসার কাছাকাছি মুশতাক বিশ্বাসের বেশ কিছু ধানী জমি আছে। ওখানকার লোকেরা সে সব জমি ভাগ চাষ করে। মুশতাক বিশ্বাসকেও মাদ্রাসা করার কথা বলে জমি দান করতে বলুন। উনি নামের কাঙাল, মনে হয় দান করতে পারেন। আর যদি দান করতে না চান, তা হলে টাকা দিয়ে কিনে নেবেন।

পরামর্শ দেয়ার জন্য শুকরিয়া। আমার বড় মা, মানে দাদাজীর মায়ের নাম জোহরা খানুম। আমি তাঁর নামে মাদ্রাসার নাম রাখতে চাই। আমার একান্ত

অনুরোধ এই মাদ্রাসার ব্যাপারে সবকিছু আপনাকেই করতে হবে। আমি শুধু টাকার ব্যবস্থা করব। আমার কথা যেন এতটুকু প্রকাশ না হয়, সে ব্যবস্থাও আপনি করবেন। তবে আজরাফ স্যারকে জানাতে পারেন। বলুন, আমার এই অনুরোধটুকু রাখবেন?

চেয়ারম্যান কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, আপনাকে সাহায্য করব বলে কথা যখন দিয়েছি তখন ইনশাআল্লাহ নিশ্চয় রাখব। কিন্তু একদিনতো আপনার কথা প্রকাশ হবেই।

হাবিব ডাক্তার আনন্দিত হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলল, ততদিনে ইনশাআল্লাহ আমার এখানে আশার উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। তারপর এবার আসি তা হলে বলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় হাবিবুর রহমান আব্বার হাত ধরে এসে সালাম দিয়ে বলল, দাদু, আমার অসুখ আল্লাহ ভালো করে দিয়েছে।

চেয়ারম্যান সাহেব তাকে বুকে জড়িয়ে চুমো খেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বললেন, এই ডাক্তার সাহেবের অসিলায় আল্লাহ তোমার জ্বর ভালো করে দিয়েছেন। যাও কদমবুসি কর বলে তাকে ছেড়ে দিলেন।

হাবিবুর রহমান কয়েক সেকেন্ড হাবিব ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে কদমবুসি করতে গেল।

হাবিব ডাক্তার তাকে জড়িয়ে ধরে আদর দিয়ে বলল, আল্লাহ তোমাকে হায়াতে তৈয়েবা দান করুক। তারপর বলল, তোমার নাম কি?

হাবিবুর রহমান।

নামের অর্থ জান?

জি, দয়ালুর বন্ধু। আল্লাহ দয়ালু, আমি তার বন্ধু।

সুবহান আল্লাহ, আল্লাহ তোমাকে তাঁর বন্ধু হওয়ার তওফিক দান করুক। তারপর বলল, তোমার যে নাম, আমারও সেই নাম। তাই এখন থেকে তুমি আমার মিতা।

হাবিবুর রহমান বলল, মিতা কি আমি তো জানি না।

মিতা মানেও বন্ধু।

হাবিবুর রহমান হাসি মুখে বলল, তা হলে আজ থেকে আপনিও আমার বন্ধু?

হাবিব ডাক্তার বলল, হ্যাঁ, তাই।

তা হলে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন। আমি কথাটা আম্মাকে জানিয়ে আসি। তারপর যেতে উদ্যত হলে চেয়ারম্যান বললেন, কারো সঙ্গে নতুন সম্পর্ক হলে মিষ্টিমুখ করাতে হয়। আম্মাকে বলে মিষ্টি নিয়ে এস।

চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে হেলথ কমপ্লেক্সে ফিরে এসে হাবিব ডাক্তার দেখল, নাদের আলি বসে আছে। সালাম ও কুশল বিনিময় করে বলল, কেন এসেছ বল।

নাদের আলি বলল, আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ করতে এলাম।

বেশ তো, কি আলাপ করতে চাও বল।

আতিকার বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। ছেলে ও ছেলেপক্ষ আতিকাকে পছন্দ করে গেছে।

হাবিব ডাক্তার মৃদু হেসে বলল, এরকমই কিছু আশা করেছিলাম। বিয়ের তারিখ কবে হয়েছে জান?

মাতব্বর চাচা দশ পনের দিনের মধ্যে করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ছেলের বাপ রাজি হয় নি। ছেলের বড় ভাই বিদেশে চাকরি করে। মাস খানেক পরে ফিরবে। সে আসার পর দিন ঠিক হবে।

ছেলের বাড়ি কোথায়?

আনন্দবাস।

তুমি এসব জানলে কিভাবে?

আতিকা তাদের চাকর হালিমকে দিয়ে চিঠি লিখে পাঠিয়েছে।

ঠিক আছে, এখন যাও। কোনো দুশ্চিন্তা করো না।

কয়েকদিন পর চেয়ারম্যান একদিন বইরাপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে মিটিং করার ব্যবস্থা করলেন। কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সব গ্রামে মাইকিং করে মিটিং এর কথা জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থাও করলেন।

মিটিং এর দিন বিভিন্ন গ্রাম থেকে ধনী, গরিব, মধ্যবিত্ত ও গণ্যমান্যসহ বহু লোকের সমাগম হল। হাফেজিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রথমে কুরআন তেলওয়াত, হামদ ও নাত পাঠ করার পর চেয়ারম্যান বললেন, বর্তমানে আল্লাহর রহমতে বাংলাদেশের শহরগুলোতে এমন কি গ্রামে, গঞ্জে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাফেজিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে সব মাদ্রাসা থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার হাফেজ তৈরি হচ্ছেন। তারা মসজিদের ইমামতি ও কুরআনিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছেন। তবু অগণিত হাফেজ বেকার রয়েছেন। অবশ্য যারা অবস্থাপন্ন ঘরের, তারা বড় বড় মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা বেশি নয়। যারা হাফেজ হচ্ছেন, তারা কুরআনের অর্থ যেমন বোঝেন না, তেমনি হাদিস ফিকাহর জ্ঞানও তাদের নেই। তাই তাদের জন্য এক মহৎ লোক এখানে এমন একটা মাদ্রাসা করতে চান। যেখানে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে হাফেজরাও সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। তারপর হাবিব ডাক্তার

যেসব কথা তাকে বলেছিল, সেসব বলে বললেন, ধর্মীয় লাইনে উচ্চ শিক্ষা নেয়ার একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হোক, এটা কি আপনারা চান?

প্রায় সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ চাই।

চেয়ারম্যান সবাইকে চুপ করতে বলে বললেন, এ ব্যাপারে আপনারা যদি কিছু বলতে চান, তা হলে বলতে পারেন।

কেউ কিছু বলার আগে মুশতাক বিশ্বাস বললেন, কিন্তু এরকম একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করাও পরিচালনা করার খরচপাতিতো আর কম না? উনি শুধু মুখে দেব বললে তো হবে না, বাস্তবে প্রমাণ দিতে হবে।

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, সেকথা আমিও তাকে বলেছি। বললেন, আপনারা একটা কমিটি তৈরি করুন। কমিটির সদস্যরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবেন। আরো বললেন, মাদ্রাসার নাম হবে "জোহরা খানুম আলিয়া মাদ্রাসা।" মাদ্রাসার গরিব ছাত্রদের জন্য এতিমখানা থাকবে আর অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের জন্য থাকবে আবাসিক হোস্টেল। কমিটি গঠন করার পর সেক্রেটারি ও এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির নামে প্রথমত দশ লাখ টাকা কার্পাসডাঙ্গা সোনালী ব্যাংকে জমা দিয়ে যৌথ একাউন্ট খুলে দেবেন। পরে আরো দেবেন। আমরা যদি সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই, তা হলে মাদ্রাসা চালু হওয়ার পর একটা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও করতে চান। সেখানে কারিগরি শিক্ষার সাথে সাথে উৎপাদনমূলক ব্যবস্থাও থাকবে। হাফেজ, মাওলানা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই-এর কর্মসংস্থান হবে এবং এর আয় মাদ্রাসার একাউন্টে জমা হবে। এরকম একটা মহৎ কাজে ধনী-গরিব নির্বিশেষে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করা উচিত। আল্লাহ আমাকে যতটুকু তওফিক দিয়েছেন, তা থেকে দশ হাজার টাকা দেয়ার ওয়াদা করছি। এবার আপনারা বলুন, কে কত দেবেন? তার আগে বলে রাখি, এই হাফেজিয়া মাদ্রাসার কাছে যাদের জমি-জায়গা আছে, তাদেরকে অনুরোধ করব, টাকা দেন বা না দেন, আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য জমি দেবেন।

মিটিং এর দিন ঠিক করার আগে চেয়ারম্যান আজরাফ হোসেনের সঙ্গে সবকিছু আলাপ আলোচনা করেছিলেন।

এখন চেয়ারম্যানের কথা শেষ হতে আজরাফ হোসেন দাঁড়িয়ে বললেন, এখানে আমার দশকাঠা জমি আছে। সেই দশ কাঠা জমি ও বিশ হাজার টাকা ইনশাআল্লাহ আমি দেব। তারপর বসে পড়লেন।

লোকজন মারহাবা মারহাবা বলে উঠল।

তিনি বসার পর হাফেজিয়া মাদ্রাসার সেক্রেটারি আব্দুল জব্বার দাঁড়িয়ে বললেন, এখানে আমার দু'বিঘে জমি ছিল, তার এক বিঘে আগেই ওয়াকফ করে

সেই জমিতেই হাফেজিয়া মাদ্রাসা করে দিয়েছি। বাকি এক বিঘে জমি ও দশ হাজার টাকা ইনশাআল্লাহ দেব।

লোকজন তাকেও মারহাবা মারহাবা বলে অভিনন্দন জানাল।

মুশতাক বিশ্বাস আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, তাকে টেক্কা দিয়ে অন্যরা নাম কিনবে তা সহ্য করতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আমি নগদ পঁচিশ হাজার টাকা ও এখানকার পাঁচ বিঘে জমি নতুন মাদ্রাসার নামে ওয়াকফ করে দেব।

এবার লোকজন আরো উচ্চস্বরে মারহাবা মারহাবা বলে অভিনন্দন জানাল।

চেয়ারম্যান এটাই আশা করেছিলেন, আশা পূরণ হতে দেখে মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আজরাফ স্যারকে দানের পরিমাণ ও তাদের নাম লিস্ট করতে বললেন।

মুশতাক বিশ্বাস বসার পর কুতুবপুর ও অন্যরা গ্রাম থেকে যারা এসেছিলেন, তারা তাদের সামর্থ্য অনুসারে নানান অংকের টাকা দেয়ার কথা বলে নাম লেখাল। শেষে হিসাব করে দেখা গেল। সাড়ে ছয় বিঘে জমি ও সোয়ালাখ টাকা হয়েছে।

চেয়ারম্যান জমি ও টাকার পরিমাণ জানিয়ে বললেন, এবার কমিটি গঠন করতে হবে। তবে কমিটিতে সদস্য হওয়ার জন্য ঐ লোক শর্ত আরোপ করেছেন। যেমন ধার্মিক ও দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। যদি তেমন লোক পাওয়া না যায়, তা হলে ধনী হোক আর গরিব হোক, গ্রামের লোকেরা যাকে ভালো বলে জানে, সে রকম লোক হলেও চলবে। তবে তাকে আস্তে ধীরে দ্বীনী এলেম হাসিল করতে হবে এবং সে সব মেনে চলারও চেষ্টা করতে হবে। এখানে বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজন এসেছেন। আপনারা নিজেদের গ্রামের ভালো লোকদের মধ্যে দু'তিনজনের নাম লিখে আমাদের কাছে দিন। প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বাহান্নজনের নাম লিস্ট করা হল।

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, লিস্টে বাহান্নজনের নাম আছে। তারা ছাড়া সবাই চলে যান। বাহান্নজনের মধ্যে কারা কমিটিতে থাকবেন এবং কে কি পদ গ্রহণ করবেন, সেটা আলাপ আলোচনার মধ্যে ঠিক করা হবে। অবশ্য পরে আপনাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে।

লোকজন চলে যাওয়ার পর চেয়ারম্যান বাহান্নজনকে নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করলেন। অন্যান্য গ্রাম থেকে মাত্র পাঁচজন কমিটিতে থাকতে রাজি হলেন। আর কুতুবপুর গ্রামের এগারটাপাড়া থেকে একজন করে নিয়ে মোট ষোলজনকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হল। কমিটির সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যানকে সেক্রেটারি আজরাফ স্যারকে এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও মুশতাক

বিশ্বাসকে সভাপতি ও বইরাপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার সেক্রেটারি আব্দুল জব্বারকে ক্যাসিয়ার করা হল।

সভা শেষ হওয়ার পর মুশতাক বিশ্বাস চেয়ারম্যানকে বললেন, যিনি এরকম একটা মহৎ কাজের জন্য দশ লাখ টাকা দিচ্ছেন, তার পরিচয়টা বলবেন না?

চেয়ারম্যান বললেন, উনি পরিচয় প্রকাশ করতে নিষেধ করে ওয়াদা করিয়েছেন। আপনারাই বলুন, ওয়াদা খেলাপ করা কী উচিত? তবে যেদিন মাদ্রাসার ভীত দেয়া হবে, সেদিন উনি থাকবেন বলেছেন।

আব্দুল জব্বার বললেন, বাড়ি কোথায় বলেন নি?

চেয়ারম্যান বললেন, ওঁর সম্পর্কে কোনো কিছুই বলতে নিষেধ করেছেন। তবে আলাপ করে বুঝতে পেরেছি, উনি খুব জ্ঞানী, দ্বীনদার ও ধনীলোক। দয়া করে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

এরপর আর কেউ কিছু না বলে বিদায় নিয়ে যে যার পথে রওয়ানা দিল।

আট

টাকা-পয়সা আদায় করার পর কমিটির মেম্বাররা মাদ্রাসার ভীত দেয়ার জন্য ঐ লোককে আনাবার ব্যবস্থা করতে চেয়ারম্যানকে বললেন।

চেয়ারম্যান বললেন, ঠিক আছে, আমি সেই ব্যবস্থা করছি।

এরমধ্যে একদিন মুশতাক বিশ্বাস একটা উকিলী নোটিশ পেলেন। নোটিশ পড়ে বুঝতে পারলেন, খাঁপাড়ার যে মেয়েকে তার দাদা গোপনে বিয়ে করেছিলেন এবং পরদাদাজী গুলি করে মেরে ফেলেছিলেন, তারই ছেলে সম্পত্তির দাবি করে কোর্টে মামলা করেছে। নোটিশ পড়ে যতটা না অবাক হলেন, তার চেয়ে বেশি রেগে গেলেন। অনেকক্ষণ থুম ধরে বসে রইলেন। এমন সময় পারভেজকে দেখতে পেয়ে কাছে ডেকে নোটিশের কাগজটা দিয়ে পড়তে বললেন।

নোটিশ পড়ে পারভেজের অবস্থা বাপের মতো হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এই নোটিশ নিয়ে একজন উকিলের সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

একদিন মুশতাক বিশ্বাস ও পারভেজ চুয়াডাঙ্গা কোর্টের নামকরা উকিল শারাফাতের কাছে গিয়ে নোটিশটা দিয়ে পরামর্শ চাইলেন।

শারাফাত খুব নামকরা উকিল। বয়স প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন। তার বাবা বিলায়েত হোসেনও নামকরা উকিল ছিলেন। মুশতাক বিশ্বাসের পরদাদা ছেলের বৌকে গুলি করে যে খুনীর আসামী হয়েছিলেন, সেই কেস তিনি ড্রিল করে আসামীকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

নোটিশ পড়ে শারাফাত উকিল বললেন, অনেক আগে একদিন বাবার মুখে শুনেছিলাম, কুতুবপুরের বিশ্বাসদের কেউ একজন পুত্রবধূকে গুলি করে খুন করেছিলেন। মনে হচ্ছে, সেই মেয়ের ছেলেই বাদি, তাই না?

মুশতাক বিশ্বাস বললেন, হ্যাঁ আপনি ঠিক ধরেছেন। আব্বার মুখে শুনেছি, সে সময় আপনার বাবাই পরদাদাজীকে বাঁচিয়েছিলেন। তাই তো আপনার কাছে এলাম। তারপর বললেন, দাদাজীর মুখেই শুনেছি, ঐ মেয়ের দু'মাসের একটা ছেলে ছিল।

শারাফাত উকিল বললেন, বাদি যদি প্রমাণ করতে পারেন, উনিই সেই ছেলে, তা হলে তার ও তার মায়ের প্রাপ্য অংশ আপনাকে দিতে হবে।

মুশতাক বিশ্বাস চিন্তিত গলায় বললেন, আপনার কী মনে হয়, বাদি প্রমাণ করতে পারবে?

মামলা যখন করেছেন, তখন প্রমাণ জোগাড় করেই করেছেন।

মুশতাক বিশ্বাস বললেন, মামলা চললে অনেক টাকাপয়সা খরচ হবে। তা ছাড়া বংশের মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়বে। বাদিকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে মামলা মিটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করুন।

তা করতে পারব; যদি বাদি রাজি হয়। তা ছাড়া বাদি যদি মোটা অংকের টাকা দাবি করেন, আপনারা দেবেন তো?

পারভেজ এতক্ষণ চুপ করেছিল, এবার আব্বা কিছু বলার আগে বলল, আপনি বাদির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দেখুন। তিনি কত টাকা দাবি করেন। তারপর যা করার আমরা আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে করব।

শারাফাত উকিল বললেন, ঠিক আছে, আপনারা এখন যান। আমি বাদির সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনাকে জানাব।

শারাফাত উকিল একদিন বাদির বাসার ঠিকানায় গেলেন। তিনি ব্যারিস্টার খলিলুর রহমানকে চেনেন। কিন্তু তিনিই যে বাদি হাসিবুর রহমানের ছেলে, তা জানতেন না। জানার পর যা বোঝার বুঝে গেলেন। তাদের সঙ্গে কেসের ব্যাপারে আলাপ করে মুশতাক বিশ্বাসের কথা মতো টাকার কথা তুলে কেস মিটিয়ে ফেলার কথা বললেন।

বাবা কিছু বলার আগে ব্যারিস্টার খলিলুর রহমান বললেন, দাদি ও বাবার অংশের সম্পত্তির মূল্য বাবদ পাঁচ লাখ, আর দাদিকে খুন করার জন্য পাঁচ লাখ, মোট দখ লাখ টাকা পেলে আমরা মামলা তুলে নিতে পারি। আর যদি দশ লাখ টাকা দিতে মুশতাক বিশ্বাস রাজি না হন, তা হলে, খুব শিঘ্রি আমরা খুনের মামলাও দায়ের করব। আমাদের দাবি ন্যায্য কিনা উকিল হিসাবে আপনি নিশ্চয় জানেন!

শারাফাত উকিল আর কিছু না বলে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন। তারপর একদিন মুশতাক বিশ্বাসকে খবর দিয়ে আনিয়ে সবকিছু জানালেন।

টাকার অংক শুনে মুশতাক বিশ্বাস ভিমরি খেয়ে চুপ করে রইলেন, আর রাগে ফুলতে লাগলেন।

পারভেজও আব্বার সঙ্গে এসেছে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, যিনি খুন করেছেন তিনি ও তার ছেলে অনেক আগে মারা গেছেন। দাদাজী ও মারা গেছেন, মরা মানুষের বিরুদ্ধে মামলা করা যায়?

শারাফাত উকিল বললেন, দেখুন বাদি বিরাট ধনী। তার এক ছেলে ব্যারিস্টার। হাইকোর্টে ওকালতি করেন। এ ব্যাপারে ওঁদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না। কি করবেন না করবেন, চিন্তা ভাবনা করে আমাকে জানাবেন। আমি সেই মতো ব্যবস্থা করব। তবে আমার মনে হয়, আপনারা নিজে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে মীমাংসা করে ফেলাই ভালো।

মুশতাক বিশ্বাস রাগের সঙ্গে বললেন, তা কখনই সম্ভব নয়। দুশমনদের সঙ্গে আলাপ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ধনী হলে কী হবে? ছোটলোকের বাচ্চা তো, তাই টাকার এত লোভ।

শারাফাত উকিল বললেন, তা হলেতো আপনাকে নির্দিষ্ট দিনে কোর্টে হাজির হয়ে নোটিশের বিরুদ্ধে জওয়াব দাখিল করতে হবে?

এ ব্যাপারে পরে আপনাকে জানাব বলে মুশতাক বিশ্বাস ছেলেকে বললেন চল, এবার ফেরা যাক। তারপর বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন।

কার্পাসডাঙ্গায় বাস থেকে নেমে হাবিব ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। সে রুগী দেখে ফিরছিল। তাদেরকে দেখে সাইকেল থেকে নেমে সালাম বিনিময় করে বলল, কোথায় গিয়েছিলেন মাতব্বর সাহেব?

মুশতাক বিশ্বাস তার কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, অনেক দিন আমাদের ওদিকে আপনাকে দেখি নি। ঢাকায় গিয়েছিলেন নাকি?

হ্যাঁ গিয়েছিলাম, আব্বা ফোন করে যেতে বলেছিলেন। তবে দু'দিন পরেই চলে এসেছি। তারপর বলল, আপনাদের ওদিকে রুগী না থাকলে যাওয়া হয় না। তবে গত সপ্তাহে বইরাপাড়ায় কাদের আলির বাড়িতে রুগী দেখতে গিয়েছিলাম। আপনাদের কারো সঙ্গে দেখা হয় নি। হেলথ কমপ্লেক্সে চলুন না, চা-টা খেয়ে যাবেন। সেই সঙ্গে আলাপও করা যাবে।

মুশতাক বিশ্বাসের হঠাৎ মনে পড়ল, ডাক্তারের বাবা ব্যারিস্টার। ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে কেসের ব্যাপারে আলাপ করলে কেমন হয়?

কি ভাবছেন মাতব্বর সাহেব? গেলে খুশি হতাম।

ঠিক আছে চল বলে মুশতাক বিশ্বাস পারভেজকে আসতে বলে এগোলেন।

হাবিব ডাক্তার তাদেরকে নিজের রুমে এনে বসাল, তারপর একজন আয়াকে ডেকে চা-নাস্তা দিতে বলল।

নাস্তা খেয়ে চা খাওয়ার সময় মুশতাক বিশ্বাস হাবিব ডাক্তারকে বললেন, একটা কেসের ব্যাপারে এক উকিলের কাছে গিয়েছিলাম। উনি বললেন, এই কেস চালান তার দ্বারা সম্ভব নয়। তারপর চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রেখে বললেন, শুনেছি, তোমার বাবা হাইকোর্টের উকিল। ভাবছি তাকে দিয়ে কেসটা চালাব। তুমি যদি আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে যেতে, তা হলে ভালো হত।

হাবিব ডাক্তার বলল, বেশ তো নিয়ে যাব। এই কয়েকদিন আগে ঢাকা গিয়েছিলাম। সপ্তাহ দুই পরে আবার যাব। তখন না হয় নিয়ে যাব।

মুশতাক বিশ্বাস বললেন, ঠিক আছে, যাওয়ার আগের দিন আমাকে জানাবে। তারপর বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

বাড়িতে পৌঁছে দেখলেন, বৈঠকখানায় ঘটক বসে আছে।

ঘটক মাতব্বর সাহেবকে আসতে দেখে বসা থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। কাছে এলে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন?

সালামের উত্তর দিয়ে মুশতাক বিশ্বাস বললেন, ভালো আছি। তারপর একটা চেয়ারে বসে তাকেও বসতে বলে বললেন, তা কি খবর নিয়ে এসেছ বল।

খবর খুব ভালো। পরশু আনন্দবাস থেকে ছেলেপক্ষরা বিয়ের পাকা কথাবার্তা বলতে আসবে।

মুশতাক বিশ্বাস আলহামদুলিল্লাহ্ বলে একটা একশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, এখন এটা রাখ। বিয়ের দিন তোমাকে খুশি করে দেব। তা ক'জন আসবে কিছু বলেছে? গতবারে তো পনের ষোলজন এসেছিল।

ঘটক বলল, এবারে বেশি লোক আসবে না। চার পাঁচজন আসবেন।

মুশতাক বিশ্বাস ছেলেকে বললেন, ঘটককে নাস্তা-পানি খাইয়ে বিদায় কর। আমি খবরটা তোমার মাকে জানাই বলে বাড়ির ভিতর চলে গেলেন।

রাতে এশার নামায পড়ে এসে চামচা রসুকে দেখে মুশতাক বিশ্বাস বললেন, কী ব্যাপার, তোমার যে কয়েকদিন পাত্তা নেই?

রসু সালাম বিনিময় করে বলল, আপনার কাজেই ব্যস্ত ছিলাম।

তা কাজটা হয়েছে।

জি, দু'টো গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছি।

বল, কি তোমার গুরুত্বপূর্ণ খবর?

প্রথমটা হল, গিয়াস বাজারে মুদি দোকান দিয়েছে। সে আর আপনার কোনো কাজ করবে না। দ্বিতীয়টা হল, হাশেম আলির মেয়ে যীনাত পোয়াতী হয়েছে।

শেষের কথাটা শুনে মুশতাক বিশ্বাস চমকে উঠে সামলে নিলেন। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কথাটা সত্য মিথ্যা যাচাই করছ?

রসু বলল, যাচাই আর কি করব? পশ্চিমপাড়ার মেয়েপুরুষ অনেকেই জানে।

তুমি কবে জেনেছ?

শুনেছি বেশ কয়েকদিন আগে। শোনার পর যার দ্বারা এই কাজ হয়েছে, তাকে জানার জন্য পশ্চিমপাড়ার মহিমকে লাগিয়েছিলাম। সে বলল, হাবিব ডাক্তারকে মাঝে মাঝে হাশেম আলির বাড়িতে রাতে থাকতে ও ভোরে চলে যেতে দেখেছে। তার কথা সত্য কিনা জানার জন্য পরশু রাতে মহিমদের ঘরে আমি রাত কাটাই। সে ও আমি হাবিব ডাক্তারকে রাতে আসতে ও ভোরে চলে যেতে দেখেছি।

মুশতাক বিশ্বাস ভাবলেন, হাবিব ডাক্তারের মতো লোক এমন গর্হিত কাজ করতে পারল? সে কি ধর্মের মুখোশ পরে এরকম শয়তানি কাজ করে বেড়াচ্ছে?

মাতব্বরকে চুপ করে থাকতে দেখে রসু আবার বলল, কথাটা আমিও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নি। তাই সত্য মিথ্যা যাচাই করে আপনাকে জানাতে এলাম। আপনি গ্রামের মাতব্বর। এরকম কাজের বিচার না করলে সবার উপর আল্লাহর গজব নাজেল হবে। আর সেজন্য আপনি দায়ী হবেন।

বিচার তো হবেই। ভাবছি, গ্রামের সবাই হাবিব ডাক্তারকে পীরের মতো মানে। তার বিচার করতে হলে ঘটনার সততার মজবুত সাক্ষীর দরকার। শুধু তোমার ও মহিমের সাক্ষীতে কাজ হবে না। তা ছাড়া হাশেম আলির ভাইপো আজরাফ মাস্টারের খুব পেয়ারের লোক হাবিব ডাক্তার। তার সাক্ষী আগে দরকার। আচ্ছা, পাড়ার লোকেরা এত বড় একটা কাণ্ড আজরাফ মাস্টারকে জানাই নি কেন বলতে পার?

সে কথা আমি মহিমকে বলেছিলাম। সে আপনার কথাটাই বলল, "হাবিব ডাক্তার আজরাফ মাস্টারের খুব পেয়ারের লোক।" তাই কেউ বলতে সাহস করে নি।

তুমি কাল আজরাফ মাস্টারকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে। আর শোন, এই ব্যাপারটা গোপন রাখবে। কারো কাছে বলবে না। বিচারের সময় সবাই জানুক, এটাই আমি চাই।

ঠিক আছে, তাই হবে। আর কিছু বলবেন?

না, তুমি এবার যাও।

পরেরদিন রসু এসে খবর দিল, আজরাফ মাস্টার আজ সকালের দিকে বৌ ছেলে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে গেছে। এক সপ্তাহ পর ফিরবে।

ঠিক আছে, এক সপ্তাহ পরে ফিরলে তাকে আমার কথা বলবে। পরশু আনন্দবাস থেকে লোকজন আসবে আতিকার বিয়ের দিন ঠিক করতে। তুমি এখন যাও। পরশুদিন সকালের দিকে এস।

জি, আসব বলে রসু চলে গেল।

মুশতাক বিশ্বাস ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারলেন না। নিজের রুমে এসে চিন্তা করতে লাগলেন, হাবিব ডাক্তার হাশেম আলির বাড়িতে রাত কাটায়, তার ভাইপো হয়ে পাশাপাশি বাড়িতে থেকে আজরাফ মাস্টারের চোখে পড়বে না, এটা কেমন করে হয়? তখন তার গিয়াসের কথা মনে পড়ল, সে বলেছিল, "হাবিব ডাক্তার যীনাতের সাথে মেলামেশা করে।" তবু কথাটা বিশ্বাস করতে পারলেন না। নামি দামি লোকের ছেলে, তার উপর শুধু একজন বড় ডাক্তার নয়, আলেমও। বিয়েও করেছে। বিয়ের কথা শুনে মনে পড়তে চিন্তা করলেন, যীনাতকেই বিয়ে করে নি তো? কিন্তু তা হলে তো গ্রামের সবাই জানত? বিয়ের কথাতো আর চাপা থাকে না? বিশেষ করে আজরাফ মাস্টারতো আগেই জানবে? সেই তো এখন তাদের সংসার চালাচ্ছে?

এমন সময় শাফিয়া বানু স্বামীকে ভাত খাওয়ার জন্য ডাকতে এসে তাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বললেন, চুপচাপ বসে আছ যে, ভাত খাবে না?

মুশতাক বিশ্বাস এতই চিন্তামগ্ন ছিলেন যে, স্ত্রীর কথা শুনতে পেলেন না। তাকিয়ে বললেন, কিছু বললে?

শাফিয়া বানু উকিলী নোটিশের কথা জানেন। নোটিশের ব্যাপারে যে আজ সকালে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে স্বামী ও ছেলে উকিলের কাছে গিয়েছিল তাও জানেন। তাই স্বামীর কথা শুনে বললেন, কী এত ভাবছিলে যে, আমার কথা শুনতে পেলে না? উকিল সাহেব কি বললেন, তাও তো বললে না? ওরা কি টাকা নিয়ে মামলা তুলে নিতে চায় নি?

মামলা তুলে নিতে চেয়েছে, তবে টাকাটা বেশি দাবি করেছে। সে যাই হোক, আমি সে কথা ভাবছি না। তারপর যীনাতের ব্যাপারটা চেপে গিয়ে বললেন, ভাবছিলাম, আতিকার বিয়েটা ভালোভাবে মিটে গেলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

শাফিয়া বানু বললেন, ওরা তো পরশু দিন আসছে। বিয়ের দিনটা কাছাকাছি করবে।

সেকথা তোমাকে বলে দিতে হবে না। পারভেজকে বাজার হাট করার লিস্ট করতে বলেছ? কালকেই সবকিছু কিনে ফেলতে হবে।

সে সব তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। পারভেজ ও বৌমা সব দায়িত্ব নিয়েছে। এখন খাবে চল। বৌমা ভাত বেড়ে বসে আছে।

আতিকার বিয়ের দিন ধার্য হল সামনের শুক্রবারের পরের শুক্রবার। মাঝখানে মাত্র দশদিন। গহনাপত্র আগেই বানিয়ে রেখেছিলেন মুশতাক বিশ্বাস। বাকি অন্যান্য সবকিছু কেনার দায়িত্ব পারভেজের উপর ছেড়ে দিলেন।

বিয়ের দু'দিন আগে সকাল থেকে আতিকাকে পাওয়া যাচ্ছে না। শাফিয়া বানু পাড়ায় পাড়ায় ও জ্ঞাতি-গুষ্ঠীদের বাড়িতে যেখানে যেখানে আতিকা বেড়াতে যায়, সবখানে কাজের মেয়েকে দিয়ে খোঁজ করালেন; কিন্তু পাওয়া গেল না। এমনকি কেউ তাকে দেখে নি বলে জানাল। শাফিয়া বানু ভাবলেন, আতিকা নাদের আলির ঘরে চলে যাই নি তো? চাকর হালিমকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই খাঁপাড়ার নাদের আলিকে চিনিস?

হালিম মাঝপাড়ার গরিবের ছেলে। তার বাবা যখন মারা যায় তখন তার বয়স ছয় বছর। বছর খানেক পর বইচিতলার একজনের সঙ্গে তার মায়ের আবার বিয়ে হয়। হালিম চাচাদের কাছে ছিল। আট বছর বয়সে চাচারা তাকে মুশতাক বিশ্বাসের বাড়িতে কাজে দেয়। এখন তার বয়স তের চৌদ্দ বছর। আতিকা তাকে খুব স্নেহ করে। ভালো মন্দ কিনে খাওয়ায়। মাঝে মধ্যে দু'পাঁচ টাকা দেয়। তাই আতিকা যা বলে তাই শোনে। তাকে দিয়েই আতিকা নাদের আলির সঙ্গে চিঠি লেন-দেন করে, দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে। হালিম আতিকাকে বুবু ডাকে। তার মা বাবাকে চাচা-চাচী ও পারভেজ ও তার স্ত্রীকে ভাই-ভাবি বলে ডাকে। সে কিশোর হলেও বুঝতে পেরেছে আতিকা বুবুও নাদের আলি ভাই একে অপরকে ভালবাসে। বিয়ের দিন ঠিক হওয়ার পর থেকে আতিকার মন খারাপ। সে গতকাল তাকে দিয়ে নাদের আলির কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। আজ তাকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে ভেবেছে, আতিকা বুবু নাদের আলি ভাইদের ঘরে পালিয়ে গেছে। তাই শাফিয়া বানু যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন নাদের আলিকে চেনে কিনা তখন ভয় পেলেও সাহস করে বলল, জে, চিনি।

তাদের ঘর চিনিস?

জে, চিনি।

তুই এক্ষুনি একবার তাদের ঘরে গিয়ে দেখে আসবি তোর আতিকা বুবু সেখানে আছে কিনা। খবরদার, চুপি চুপি যাবি আর আসবি। আমি যে তোকে পাঠিয়েছি, কাউকে বলবি না। ওখান থেকে সোজা আমার কাছে আসবি।

জে আচ্ছা, বলে হালিম বেরিয়ে গেল।

শাফিয়া বানু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রায় একঘণ্টা পর হালিম ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, আছে?

হালিম মন ভার করে বলল, না নেই।

নাদের আলি আছে?

সেও নেই।

ঘরে আর কে কে আছে?

নাদের আলি ভাইয়ের তো কেউ নেই, শুধু এক ফুফু আছে। তাকে জিজ্ঞেস করতে বলল, কাজে গেছে।

ঠিক আছে, তুই তোর কাজে যা বলে শাফিয়া বানু চিন্তা করলেন, আর দেরি না করে স্বামী ও ছেলেকে কথাটা জানান দরকার।

পারভেজের স্ত্রী সায়লা ননদকে সকাল থেকে দেখতে না পেয়ে শাশুড়ীকে কয়েকবার তার কথা জিজ্ঞেস করেছে। পাড়ার কারো বাড়িতে হয়তো বেড়াতে গেছে বলে তিনি এড়িয়ে গেছেন। দুপুর হয়ে যেতেও যখন তাকে ফিরতে দেখল না তখন সায়লা শাশুড়ীকে বলল, আম্মা, বুবুতো এখনও এল না, কোথায় গেল একটু খোঁজ নিলে হত না?

শাফিয়া বানু চিন্তিত মুখে বললেন, মেয়েটা দিন দিন খুব বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে। কোথাও গেলে বলে যাবি তো? তা না, সেই যে সকালে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়েছে, এখনও ফেরার নাম নেই।

সায়লা বলল, আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে আম্মা!

এতে তোমার আবার ভয় পাওয়ার কি আছে?

আনন্দবাস থেকে যেদিন লোকজন এসে বিয়ের দিন ঠিক করে গেল, সেদিন তার মন খারাপ দেখে বললাম, বুবু তোমার মন খারাপ কেন? এখন তো খুশি হওয়ার কথা? বলল, এ বিয়েতে আমার মত নেই। আমি বললাম কেন? বলল, সে কথা তোমাকে বলা যাবে না। অনেক আদর ও কাকুতি মিনতি করতে বলল, আমি এই গ্রামের একটা ছেলেকে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ভালবাসি। তাকে ছাড়া আর কারো সঙ্গে বিয়ে বসতে পারব না। জিজ্ঞেস করলাম, ছেলেটাও কি তোমাকে ভালবাসে? বলল, হ্যাঁ, সেও আমাকে ভীষণ ভালবাসে। ছেলেটার পরিচয় জানতে চাইতে বলল, আম্মা, আব্বা ও ভাইয়া জানে। তারা ঐ ছেলের সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানতে পেরে আনন্দবাসের একটা বাজে ছেলের সঙ্গে তড়িঘড়ি করে বিয়ে দিতে যাচ্ছে। আমারও এক কথা, তাকে ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিলে যা করব, তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

তুমি কী কথাগুলো পারভেজকে বলেছ?

জি, ঐদিন রাতেই বলেছি।

শুনে পারভেজ কি বলল?

খুব রেগে উঠে বলল, এসব কথা কাউকে বলবে না। ও যাকে ভালবাসে, তার বংশের সঙ্গে আমাদের দুশমনি। আতিকা আমার একমাত্র বোন। তাকে আমি যে কতটা ভালবাসি তা তুমিও জান। তবু দুশমনি বংশের ছেলের সঙ্গে ওর

বিয়ে কিছুতেই দিতে পারি না। তা ছাড়াও ছেলেটা অন্য বংশের। বিশ্বাস বংশের হলেও না হয় কথা ছিল। ওর জন্য আমরা বংশের সম্মান নষ্ট করতে পারি না। তাই আমরা অন্য গ্রামের বিশ্বাস বংশেই বিয়ের ব্যবস্থা করেছি।

আমি বললাম, তা না হয় বুঝলাম; কিন্তু বুবু তো বলছিল, ছেলেটা নাকি খুব খারাপ?

ছেলে ভালো না খারাপ, তা আমরা না জেনে কি বিয়ে দিচ্ছি? ওর কথা আর বলবে না, পারলে ওকে বোঝাও।

শাফিয়া বানু বললেন, তুমি ওকে বুঝিয়েছিলে?

সায়লা বলল, বোঝাতে চেয়েছিলাম; কিন্তু দু'একটা কথা বলতে না বলতে রেগে উঠে আমার কাছ থেকে চলে গেল। তারপর বলল, এখন কি হবে আম্মা?

ভাবছি, দুপুরে খাওয়ার পর পারভেজকে ও তার আব্বাকে জানাব।

হ্যাঁ আম্মা, তাই জানান। আমার তো ভয় হচ্ছে। বুবু যা জেদী, কোনো অঘটন না ঘটিয়ে ফেলে।

শাফিয়া বানুও পেটের মেয়েকে ভালভাবেই জানেন। তিনিও ঐ কথা ভেবে ভয় পাচ্ছেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, সেইজন্য আমারও খুব চিন্তা হচ্ছে। এমন সময় স্বামীকে নামায পড়ে আসতে দেখে বললেন, তোমার শ্বশুর এসে গেছে, যাও ভাত বাড়।

খাওয়া-দাওয়ার পর শাফিয়া বানু স্বামীকে কয়েকটা পান সেজে পিরীচে করে দিয়ে বললেন, আতিকাকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

মুশতাক বিশ্বাস চমকে উঠে বললেন, পাওয়া যাচ্ছে না মানে? সকালে নাস্তা খাই নি?

না। মনে করেছিলাম, পাড়ায় কোনো আত্মীয়ের বাড়ি গেছে, সেখানেই হয়তো নাস্তা খেয়েছে। দুপুর পর্যন্ত না আসায় কাজের মেয়েকে খোঁজ করতে পাঠিয়েছিলাম। সে ফিরে এসে বলল, কোনো বাড়িতেই নাকি যাই নি।

মুশতাক বিশ্বাস স্ত্রীর উপর খুব রেগে গেলেন। রাগের সঙ্গে বললেন, এখন বেলা আড়াইটা বাজে, এতক্ষণ জানাও নি কেন?

বললাম তো, মনে করেছিলাম কারো বাড়ি বেড়াতে গেছে। না বলে সে তো প্রায় কারো না কারো বাড়ি যায়।

বৌমা কথাটা জানে?

জানে। সে তো কয়েকবার আতিকার কথা জিজ্ঞেস করেছে।

মুশতাক বিশ্বাস শোয়া থেকে উঠে একটা পান মুখে দিয়ে দু'টো হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর দুই তিনজন কাজের লোককে আতিকার খোঁজে পাঠালেন।

স্কুল ছুটির পর পারভেজ ঘরে এলে মুশতাক বিশ্বাস আতিকার কথা বলে বললেন, আমি দু'তিনজনকে খুঁজতে পাঠিয়েছি। তুমি কাউকে নাদের আলির ঘরে পাঠিয়ে খোঁজ নাও।

সবাই সারাদিন খোঁজ করে আতিকাকে পেল না। পারভেজ যাকে নাদের আলির ঘরে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিল, সেও ফিরে এসে বলল, আতিকা সেখানে যায় নি। আর নাদের আলিও ঘরে নেই। কোথায় গেছে তার ফুফু জানে না।

কথাটা শুনে পারভেজের ধারণা হল, আতিকাকে নিয়ে নাদের আলি পালিয়ে গেছে। আব্বাকে তার ধারণার কথা বলল।

মুশতাক বিশ্বাসও ঐরকম ধারণা করেছিলেন। ছেলের কথা শুনে ধারণাটা দৃঢ় হল। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, ছোটলোকের বাচ্চাকে একবার পেয়ে নিই, তারপর যে কি করব, তা....রাগে কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

পারভেজ বলল, নাদের আলিকে যা করবেন পরে চিন্তা করলে চলবে। পরশু বিয়ের দিন। সে ব্যাপারে কি করবেন আগে চিন্তা করুন।

বাপ-ছেলেকে কথা বলতে দেখে শাফিয়া বানু এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পারভেজের কথা শুনে বললেন, কাল দুপুর পর্যন্ত যদি আতিকা ও নাদের আলি না ফেরে, তা হলে বিকেলে পারভেজ আনন্দবাস গিয়ে বলে আসুক, "গত রাত থেকে আতিকার খুব জ্বর। জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে। তাই বিয়ের দিন পিছাতে হবে। আতিকা সুস্থ হওয়ার পর আমরা এসে বিয়ের দিন ঠিক করে যাব।"

স্ত্রীর কথায় মুশতাক বিশ্বাসের রাগ একটু কমল। ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার মা ভালো কথা বলেছে। তা ছাড়া মান-সম্মান বাঁচাবার মতো অন্য কোনো পথওতো খুঁজে পাচ্ছি না।

পারভেজ বলল, তাই করতে হবে। আমিও অন্য কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছি না।

পরের দিন দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন আতিকা ও নাদের আলি ফিরল না তখন সবাই-এর বদ্ধ ধারণা হল, ওরা পালিয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে পারভেজ বিকেলে আনন্দবাস গিয়ে আতিকার অসুখের কথা বলে বিয়ের দিন পিছিয়ে দিয়ে এল। রাতে আব্বাকে বলল, কাল সকালে দামুড়হুদা গিয়ে থানায় নাদের আলির নামে আতিকাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কেস দিতে হবে।

মুশতাক বিশ্বাস বললেন, হুট করে থানায় কিছু করা ঠিক হবে না। জানাজানি হয়ে গেলে বিয়েটা ভেঙ্গে যাবে। যা করার ভেবে চিন্তে করতে হবে।

সন্ধ্যের পর রসুকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে মুশতাক বিশ্বাস বললেন, কোনো খবর পেলে?

রসু বলল, জি পেয়েছি। আমার চাচাতো ভাই জাফর পরশু দিন ভোরে চুয়াডাঙ্গা গিয়েছিল। যাওয়ার সময় কার্পাসডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে হাবিব ডাক্তারের

সঙ্গে একটা বোরখাপরা মেয়েকে কথা বলতে দেখে মনে করেছিল, হয়তো কোনো পরিচিত রুগী টুগী হবে। একটু পরে সেখানে নাদের আলি এলে হাবিব ডাক্তার তার হাতে একটা চিঠির খাম দিয়ে তাকে ও বোরখাপরা মেয়েটাকে ঢাকার বাসে তুলে দিলেন। জাফর মনে করেছিল, বোরখাপরা মেয়েটা নাদের আলির ফুফু। আজ সন্ধ্যের আগে বাড়িতে এসে কথাটা আমাকে বলে। শুনে আমার ধারণা হল, বোরখাপরা মেয়েটাই আতিকা। নাদের আলির ফুফুতো ঘরেই আছে। আমার ধারণা যদি ঠিক হয়, তা হলে হাবিব ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে সত্য মিথ্যা জানা যাবে। তাই তাড়াতাড়ি আপনাকে খবরটা দিতে এলাম।

মুশতাক বিশ্বাস রসুর কথা অবিশ্বাস করতে পারলেন না। ভাবলেন, সেদিন নাদের আলির সঙ্গে আতিকার বিয়ে দেয়ার জন্য যখন হাবিব ডাক্তার অনেক কথা বলেছে তখন সেই নিশ্চয় ওদেরকে পালাবার যুক্তি দিয়েছে। পারভেজকে ডেকে রসুর কথা বলে বললেন, আমাদের ধারণাই ঠিক, নাদের আলি আতিকাকে নিয়ে ঢাকা পালিয়ে গেছে। আর হাবিব ডাক্তার ওদেরকে পালাবার যুক্তি দিয়েছে।

পারভেজ বলল, আমারও মনে হচ্ছে, হাবিব ডাক্তারের পরামর্শ মতো ওরা ঢাকা চলে গেছে। কালকে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই সবকিছু জানা যাবে।

মুশতাক বিশ্বাস বললেন, হ্যাঁ, তাই করতে হবে। তারপর রসুকে বললেন, কাল বেলা দু'টোর দিকে কার্পাসডাঙ্গা গিয়ে হাবিব ডাক্তারকে আমার অসুখের কথা বলে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। এখন তুমি যাও।

রসু চলে যাওয়ার পর পারভেজকে বললেন, চেয়ারম্যান ও কয়েকজন মুরব্বীদের বিকেল চারটের সময় আসতে বলবে। আর আজরাফ মাস্টার শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরেছে কিনা খোঁজ নেবে। ফিরে থাকলে তাকেও আসতে বলবে।

তুমি শুনেছ কিনা জানি না, পশ্চিমপাড়ার হাশেম আলির বিধবা মেয়ে যীনাতের সঙ্গে হাবিব ডাক্তারকে জড়িয়ে গ্রামে কুৎসা রটেছে। দু'তিন দিন আগে কয়েকজন এসে সে কথা জানিয়ে বিচার বসাতে বলে গেছে। কাল দু'টো বিচার একসঙ্গে হবে।

আতিকার ব্যাপারটা পারভেজ বিশ্বাস করলেও যীনাতের ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারল না। অবাক কণ্ঠে বলল, হাবিব ডাক্তার এরকম কাজ করতে পারেন না। হয়তো তার কোনো দুশমন তাকে হেয় করার জন্য মিথ্যে কুৎসা রটাবার ব্যবস্থা করেছে।

মুশতাক বিশ্বাস রেগে উঠে বললেন, আর সে যে তোমার বোনকে নিয়ে নাদের আলির পালাবার সুযোগ করে দিল, সেটাও কী বিশ্বাস কর না?

তা করব না কেন? কিন্তু হাবিব ডাক্তারের নামে যে কুৎসা....।

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মুশতাক বিশ্বাস বললেন, তুমি বিশ্বাস না করলেও আমি করি। কাল দু'টো ব্যাপারের বিচার করবই।

নয়

আতিকার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যেতে নাদের আলি খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। কি করবে না করবে চিন্তা করে ঠিক করতে না পেরে হাবিব ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য কার্পাসডাঙ্গা গেল। সালাম ও কুশল বিনিময় করে কথাটা জানাল।

হাবিব ডাক্তার বলল, তোমাদেরকে তো বলেছি এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবে না, যা করার আমিই করব? কথাটা শুনে আমি আতিকার সঙ্গে দেখা করেছি। যা বলছি শোন, বিয়ে তো শুক্রবার। বুধবার দিনগত রাত তিনটের সময় আমি বিশ্বাসপাড়ার রাস্তার মোড়ে থাকব, তুমি আসবে। আতিকাকেও ঐ সময়ে আসতে বলেছি। আজ তুমি না এলে কাল আমি তোমার কাছে যেতাম। তোমাদেরকে ফার্স্ট বাসে ঢাকায় আমাদের বাসায় পাঠিয়ে দেব। সেখানে তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছি। ঘরে গিয়ে খালাআম্মাকে সবকিছু বুঝিয়ে চিন্তা করতে নিষেধ করবে। এখন তুমি যাও।

জি করব বলে নাদের আলি বিদায় নিয়ে ফিরে এল। তারপর থেকে কাজকাম করলেও মনে এতটুকু শান্তি নেই। কেবলই মনে হয়, অত রাতে আতিকা আসতে পারবে তো? যদিও আসে, কেউ দেখে ফেললে কি করবে?

আজ বুধবার। কোনো কাজ করতে ভালো লাগছিল না বলে নাদের আলি সকাল থেকে ঘরেই রইল। যোহরের নামায পড়ে খাওয়ার পর হাবিব ডাক্তারের কথাগুলো ফুফুকে বলে বলল, কেউ আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে, কোথায় গেছি জান না।

হানিফা খাতুন আতঙ্কিত স্বরে বললেন, মাতব্বর রেগে গিয়ে কি করবে ভেবেছিস? যদি লোকজন পাঠিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করে?

এসব ভেবে মন খারাপ করো না। ডাক্তার ভাই থাকতে তোমার কোনো ভয় নেই। কেউ তোমার কিছু করবে না। আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকবে। আজরাফ স্যার দু'একদিনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসবেন। তাকে সবকিছু বলে তাদের ঘরেও থাকতে পার। এমন সময় হালিমকে আসতে দেখে এগিয়ে গিয়ে বলল, কী খবর হালিম?

হালিম পেট কাপড় থেকে একটা ভাঁজ করা চিঠি বের করে বলল, বুবু দিয়েছে। আর এই চিঠির উত্তর দিতে বলেছে।

নাদের আলি সেখানেই চিঠি খুলে পড়তে শুরু করল—

নাদের আলি ভাই,

সালাম নেবে। পরে জানাই যে, এই ক'দিন খুব দুশ্চিন্তায় কিভাবে যে কাটছে তা আল্লাহ জানেন। ডাক্তার ভাইয়ের কথামতো আজ রাত তিনটের সময় রাস্তার মোড়ে আসব। তিনি আগের থেকে ওখানে থাকবেন বলেছেন। তোমাকেও নিশ্চয় ঐ সময়ে আসতে বলেছেন। সাড়ে তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করব। যদি না আস, তা হলে সঙ্গে যে বিষের শিশি থাকবে, ডাক্তার ভাই বোঝার আগেই খেয়ে ফেলব। তবু ঘরে ফিরে যাব না। আশা করি, ঐ সময়ের মধ্যে নিশ্চয় আসবে। দো'য়া করি, আল্লাহ্ যেন আমাদের মনের আশা পূরণ করেন। আমার মন বলছে, তুমি আসবে। তবু সিওর হওয়ার জন্য এই চিঠি লিখে হালিমকে পাঠালাম। আর হ্যাঁ, ডাক্তার ভাই যে বোরখাটা তোমাকে দিয়েছেন, সেটা নিয়ে আসতে ভুল করবে না।

ইতি

তোমার আতিকা

চিঠি পড়া শেষ করে হালিমকে জিজ্ঞেস করল, খেয়েছিস?

জে।

তুই গিয়ে তোর বুবুকে বলবি, ঠিক সময়ে আমি আসব। আর দেরি করিস না, তাড়াতাড়ি চলে যা। কেউ দেখে ফেলতে পারে।

হালিম চলে যাওয়ার পর নাদের আলি ফুফুকে চিঠির কথা বলে বলল, যা যা বললাম, সেই মতো করবে।

সারারাত নাদের আলি যেমন ঘুমাতে পারল না, তেমনি আতিকাও পারল না। তারপর ঠিক সময়মতো দু'জনে প্রায় একসঙ্গে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছাল।

হাবিব ডাক্তার কিছুক্ষণ আগে এসে তাদের অপেক্ষায় ছিল। সালাম বিনিময় করে জিজ্ঞেস করল, তোমাদেরকে কেউ দেখে নি তো?

দু'জনেই বলল, না।

হাবিব ডাক্তার তাদেরকে নিয়ে কার্পাসডাঙ্গায় নিজে রুমে এসে প্রথমে সবাই ফজরের নামায পড়ল। তারপর চা-নাস্তা খাইয়ে বাসে তুলে দেয়ার সময় একটা চিঠি নাদের আলিকে দিয়ে বলল, আমার আব্বা তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার

জন্য বাসস্ট্যান্ডে গাড়ি নিয়ে থাকবেন। গতরাতে আমি তাকে ফোন করে তোমাদের যাওয়ার কথা জানিয়েছি। একটু পরে আবার ফোন করে যাওয়ার কথা ও তোমাদের পোশাকের কথা জানিয়ে দেব। উনি তোমাদেরকে চিনে ফেলবেন। তাকে এই চিঠিটা দিও।

আজ তিন দিন হাবিব ডাক্তার তাদেরকে ঢাকায় নিজেদের বাসায় পাঠিয়েছে। তার বাবা খলিলুর রহমান প্রায় প্রতিদিন ফোন করে খবরা-খবর নেন। গত রাতে জানিয়েছেন, ঐদিনই বাসায় কাজি নিয়ে এসে তাদের বিয়ে পড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তারা ভালো আছে।

আজ বেলা দেড়টা পর্যন্ত রুগী দেখা শেষ করে রুমে যাবে, এমন সময় রসু এসে হাজির। বলল, কী খবর রসু?

রসু সালাম বিনিময় করে বলল, মাতব্বর সাহেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আপনাকে যেতে হবে।

হাবিব ডাক্তার বলল, ঠিক আছে, আপনি যান। আমি যোহরের নামায পড়ে খাওয়া দাওয়া করে আসছি।

বিকেল চারটের সময় হাবিব ডাক্তার মুশতাক বিশ্বাসের বাড়িতে এসে দেখল, বৈঠকখানায় লোক গিজ গিজ করছে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অন্যান্য পাড়ার মুরুব্বীরা, চেয়ারম্যান ও আজরাফ স্যারও রয়েছেন। মাতব্বর সাহেব তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। সাইকেল স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে সালাম দিয়ে মুশতাক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করে বলল, রসুর কাছে শুনলাম আপনি খুব অসুস্থ! কিন্তু আপনাকে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না?

মুশতাক বিশ্বাস বললেন, আমার কিছু হয় নি। ঐ কথা বলে তোমাকে আনার জন্য রসুকে পাঠিয়েছিলাম। ওখানে বস বলে একটা খালি চেয়ার দেখালেন।

হাবিব ডাক্তার বসে বলল, মনে হচ্ছে, গ্রামের কোনো ব্যাপারে সালিশ ডেকেছেন। এর মধ্যে আমাকে ডেকে পাঠালেন কেন বুঝতে পারছি না?

মুশতাক বিশ্বাস চেয়ারম্যানকে বললেন, যা বলার এবার আপনি বলুন।

চেয়ারম্যান আসার পর মুশতাক বিশ্বাস তাকে নাদের আলি ও আতিকা হাবিব ডাক্তারের যোগসাজসে ঢাকা পালিয়ে যাওয়ার কথা ও পশ্চিমপাড়ার হাশেম আলির মেয়ে যীনাতের সঙ্গে তার কুসম্পর্কের কথা জানিয়ে যখন বিচারের কথা বলেন তখন তিনি মনে মনে হাবিব ডাক্তারের প্ল্যানের প্রশংসা না করে পারলেন না। বললেন, ঘটনা সত্য প্রমাণ হলে হাবিব ডাক্তারের উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আজরাফ মাস্টারকে খবর দেন নি?

মুশতাক বিশ্বাস বললেন, কয়েকদিন আগে সে শ্বশুরবাড়ি সপরিবারে গিয়েছিল। গতকাল সন্ধ্যেয় ফিরেছে। তাকেও খবর দেয়া হয়েছে। এমন সময় আজরাফ হোসেনকে আসতে দেখে বললেন, ঐতো এসে গেছে।

আজরাফ হোসেন সালাম ও কুশল বিনিময় করে চেয়ারম্যানের পাশে বসলেন। তারপর মুশতাক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হঠাৎ ডেকে পাঠালেন কেন?

চেয়ারম্যানকে যে সব কথা মুশতাক বিশ্বাস বলেছিলেন, সে সব কথা তাকেও বললেন।

আজরাফ হোসেন শুনে ভাবলেন, হাবিব ডাক্তার কিভাবে ম্যানেজ করে দেখা যাক। তাই কিছু না বলে চুপ করে রইলেন।

মুশতাক বিশ্বাসের কথায় চেয়ারম্যান হাবিব ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সালিশী বসেছে আপনাকে নিয়ে। কোনো কারণে আপনি যদি না আসেন, তাই মাতব্বর সাহেব নিজের অসুখের কথা বলে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনার বিরুদ্ধে দু'টো নালিশ আছে। তার একটা হল, পশ্চিমপাড়ার হাশেম আলির বাড়িতে আপনাকে রাতে যাতায়াত করতে অনেকে দেখেছে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে সেখানে রাতেও থাকেন। এখন যীনাতের পেটে বাচ্চা এসেছে জেনে তারা মাতব্বর সাহেবের কাছে আপনাকে দায়ী করে বিচার দাবি করেছে। হাশেম আলি ও তার মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠান হয়েছিল। তারা আসে নি। বলেছে, সালিশীতে যা রায় হবে, তা তারা মেনে নেবে। দ্বিতীয় নালিশ হল, মাতব্বরের মেয়ে আতিকাকে নিয়ে নাদের আলির ঢাকা পালিয়ে যাওয়ার পিছনে যে আপনার যোগসাজস আছে, তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। এখন আপনার কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন।

হাবিব ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ থেকে কি বলবে ভেবে নিয়ে বলল, প্রথম নালিশের জওয়াবে বলব, যীনাতকে আমি প্রায় ছয় সাত মাস আগে বিয়ে করেছি। তারপর পরিস্থিতি দেখার জন্য চুপ করে রইল।

তার কথা শুনে চেয়ারম্যান ও আজরাফ হোসেন ছাড়া সবাই খুব অবাক হয়ে কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না।

প্রথমে মুশতাক বিশ্বাস বললেন, শুধু মুখে বিয়ে করেছি বললে তো হবে না, প্রমাণ দেখাতে হবে।

হাবিব ডাক্তার বলল, বিশেষ কারণে আমি বিয়েটা গোপনে করেছি। আর যারা বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাদেরকেও কথাটা গোপন রাখতে বলেছিলাম। তাই তারা, হাশেম চাচা ও তার একজন আত্মীয় ছাড়া আর কেউ জানেন না।

মুশতাক বিশ্বাস বললেন, যারা তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাদের নাম বল।

যে কারণে আমি গোপনে বিয়ে করেছি, সেই একই কারণে তাদের নাম বলতে পারব না। আমি খুব অবাক হচ্ছি, আপনারা হাশেম আলি চাচার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করেন নি কেন? তিনি মেয়ের বাবা, তাকে জিজ্ঞেস করলে সত্য মিথ্যা জানতে পারতেন।

এবার দ্বিতীয় নালিশের জওয়াবে বলব, দু'টো তরতাজা ফুলের মতো জীবনকে বাঁচবার জন্য আমাকে এই কাজ করতে হয়েছে। এখানে আসার কিছুদিনের মধ্যে ওদের সম্পর্কের কথা জানতে পেরে দু'জনকেই অনেক বুঝিয়ে এই পথ থেকে ফিরে আসতে বলি; কিন্তু নাদের আলি কিছুটা বুঝলেও আতিকা বুঝল না। তার এক কথা, নাদের আলিকে ছাড়া সে বাঁচবে না। যদি বাবা মা জোর করে অন্য কোথাও বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে, তা হলে বিয়ের আগেই বিষ খাবে। তাই সে একটা বিষের শিশি সব সময় কাছে রাখত। এসব জানার পর কিছুদিন আগে আমি মাতব্বর সাহেব ও তার ছেলের সঙ্গে ওদের বিয়ে দিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আলাপ করি। ওঁরা আমার কথায় কান না দিয়ে অন্য জায়গায় আতিকার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। আমি একথা জানতাম না। একদিন সূতাপাড়া থেকে রুগী দেখে ফেরার সময় আতিকার সঙ্গে দেখা। সে বিয়ের কথা জানিয়ে বলল, আপনি তো আমার জন্য কিছুই করতে পারলেন না। তারপর বিষের শিশি দেখিয়ে বলল, এটা নিশ্চয় আমাকে সাহায্য করবে। আমি যে তাকে নিজের বোনের মতো মনে করি, তাও মাতব্বর সাহেবকে ঐদিন বলেছিলাম। তাই বড় ভাই হিসাবে ছোট বোনকে বাঁচবার জন্য বাধ্য হয়ে তাদেরকে ঢাকায় পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার জন্য সহযোগিতা করেছি। শুধু তাই নয়, তাদেরকে আমাদের বাসায় পাঠিয়ে বিয়ে পড়াবার ব্যবস্থাও করেছি। তারা বিয়ের পর আমাদের বাসাতেই সুখে দিন কাটাচ্ছে। এতে যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে, তবে যে শাস্তি আপনারা দেবেন তা মাথা পেতে নেব। তারপর আমার আর কিছু বলার নেই বলে হাবিব ডাক্তার চুপ করে গেল।

যীনাতকে বিয়ে করার কথা শুনে সবাই যতটা না অবাক হয়েছিল, আতিকা ও নাদের আলির ব্যাপারে সবকিছু শুনে আরো বেশি অবাক হয়ে অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। তারপর লোকজনের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। অনেকে বলাবলি করতে লাগল, হাবিব ডাক্তারের মতো ভালো মানুষের নামে মাতব্বর সাহেবের সালিশ ডাকা ঠিক হয় নি। ওনার মতো লোক এই জামানায় আছে কিনা সন্দেহ। ভালো করে খোঁজ খবর না নিয়ে যার তার কথায় সালিশ ডাকা কি উচিত হয়েছে?

আজরাফ হোসেন সবাইকে চুপ করতে বলে বললেন, যীনাত আমার চাচাত বোন। হাবিব ডাক্তার আমার স্ত্রীর চিকিৎসা করার সময় তাকে দেখে ও তার

সবকিছু জেনেও আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আমিই তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করি। তিনি বিয়ের কথা গোপন রাখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তাই প্রকাশ করি নি। ওদের কুসম্পর্কের কথা জানার পর মাতব্বর সাহেবের উচিত ছিল, আমার সঙ্গে বা হাশেম চাচার সঙ্গে আলাপ করা। কেন যে উনি তা না করে সালিশ ডাকলেন বুঝতে পারছি না। আমি এই কয়েকদিন বাড়িতে ছিলাম না। গত সন্ধ্যায় ফিরেছি। আজ সকালে মাতব্বর সাহেবের লোক আসার জন্য খবর দিতে এসেছি। যাই হোক, মানুষ মাত্রই ভুল করে। আমার মনে হয়, উনি ভুলই করেছেন। তারপর চেয়ারম্যানের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি বলেন?

চেয়ারম্যান বললেন, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। উনি আপনার সঙ্গে বা হাশেম আলির সঙ্গে আলাপ না করে ভুলই করেছেন। তারপর মুশতাক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আতিকা ও নাদের আলির ব্যাপারে হাবিব ডাক্তারকে কি শাস্তি দিতে চান আপনিই বলুন।

যীনাতের ব্যাপারে যে ভুল করেছেন, তা বুঝতে পেরে মুশতাক বিশ্বাস নিজের কাছে নিজে খুব ছোট হয়ে গেলেন। তাই চেয়ারম্যানের কথা শুনে কি বলবেন চিন্তা করতে লাগলেন।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে হাবিব ডাক্তার বলল, মাতব্বর সাহেব যা শাস্তি দেবেন তা মাথা পেতে নেব একটু আগে বলেছি। তার আগে আপনাদের সবাই-এর কাছে অনুরোধ, নতুন মাদ্রাসার ভীত দেয়া না হওয়া পর্যন্ত উনি যেন শাস্তির কথা ঘোষণা না করেন। তার কারণ উনি একটা সমস্যা সমাধানের জন্য আমার কাছে সাহায্য চেয়েছেন। আমি সাহায্য করার ওয়াদাও করেছি। আশা করি, ইনশাআল্লাহ নতুন মাদ্রাসার ভীত দেয়ার আগেই সমস্যার সমাধান করে দিতে পারব।

কেউ কিছু বলার আগে আজরাফ হোসেন বলে উঠলেন, আমি হাবিব ডাক্তারের অনুরোধ অনুমোদন করলাম।

তিনি থেমে যেতে চেয়ারম্যান বললেন, আমিও অনুমোদন করছি।

তারপর অন্যান্য গণ্যমান্য লোকেরাও তাই বললেন।

মুশতাক বিশ্বাস কিছু না বলে চুপ করেই রইলেন।

পারভেজ আগে হাবিব ডাক্তারকে সবাই-এর মতো ভালো মনে করত। এখন তার কথা শুনে খুব মহৎ মনে হল। আব্বার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, আব্বার পক্ষ থেকে আমিও অনুমোদন করছি।

নাদের আলির ফুফু হানিফা খাতুনকে এতক্ষণ হাবিব ডাক্তার লক্ষ্য করে নি। এখন দেখতে পেয়ে তার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলল, ঐ বৃদ্ধাকে সালিশীতে ডেকে আনা উচিত হয় নি। দোষ করলে নাদের আলি করেছে, উনি তো করেন

নি? একজনের দোষে অন্যজনকে শাস্তি দেয়ার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয় নি।

চেয়ারম্যান হানিফা খাতুনকে বললেন, আপনাকে ডেকে আনার জন্য সবাই-এর পক্ষ থেকে আমি মাফ চাইছি। আপনি ঘরে চলে যান।

হানিফা খাতুন চাদরমুড়ি দিয়ে ও ঘোমটা দিয়ে একপাশে গুটিশুটি হয়ে বসেছিলেন। চেয়ারম্যানের কথা শুনে উঠে চলে গেলেন।

চেয়ারম্যান সালিশীর কাজ শেষ ঘোষণা করে সবাইকে চলে যেতে বললেন। সবাই চলে যাওয়ার পর মুশতাক বিশ্বাসকে বললেন, আসলে হাবিব ডাক্তার খুব সৎ ছেলে। তার নামে সালিশ ডাকার আগে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল। তারপর পারভেজকে বললেন, তোমার আব্বা না হয় ভুল করেছেন, শিক্ষিত ছেলে হয়ে তোমারও ভুল করা উচিত হয় নি। যাক, যা হওয়ার হয়েছে। একটা কথা না বলে পারছি না, পূর্ব-পুরুষদের শত্রুতার জের জিইয়ে না রেখে মিটিয়ে ফেলাই ভালো। আপনারা যে কাজ পারেন নি, হাবিব ডাক্তার সেই কাজ করার চেষ্টা করেছেন। মনে রাখবেন, আপনাদের একটিমাত্র মেয়েকে বাঁচানোর জন্য তিনি যা করেছেন, তা দোষের নয়, বরং প্রশংসনীয়। তা ছাড়া ভেবে দেখুন, আপনি তার নামে সালিশ ডাকার পরও আপনার সমস্যার সমাধান করে দেবেন বললেন। এটা কি তার মহৎ গুণের পরিচয় নয়? কথাগুলো চিন্তা করে দেখবেন। তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

চেয়ারম্যান চলে যাওয়ার পর পারভেজ আব্বাকে বলল, আপনাকে কবে থেকে বলছি, মাতব্বরী ছেড়ে দেন, আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করে বাকি জীবন কাটান। আমার কথা শুনলে গ্রামের সবার কাছে আজ অপদস্থ হতেন না।

মুশতাক বিশ্বাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, তোমার কথা না শুনে ভুলই করেছি। আর সেই ভুলটা তুমি ছেলে হয়ে শুধরে দিতে না পারলেও আজ হাবিব ডাক্তার পেরেছে।

এই ঘটনার সপ্তাহ খানেক পর একদিন চেয়ারম্যান কার্পাসডাঙ্গা গিয়ে হাবিব ডাক্তারকে মাদ্রাসার জন্য জমি রেজিস্ট্রি ও টাকা পয়সা আদায়ের কথা জানিয়ে বললেন, আপনি তো বলেছিলেন আপনার দাদাজী ভীত দেবেন। আপনার বাবা ও ভাইয়েরাও সঙ্গে থাকবেন। এবার তাদের সঙ্গে আলাপ করে দিন ঠিক করুন।

হাবিব ডাক্তার বলল, তাদের সঙ্গে আলাপ করা লাগবে না। কাল শুক্রবারের পরের শুক্রবার ভীত দেয়া হবে, একথা সবাইকে জানিয়ে দিন। তারা আগের দিন এসে যাবেন। এরমধ্যে মাদ্রাসার নামের সাইনবোর্ডটা তৈরি করিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবেন।

তাতো করবই। আচ্ছা, মাতব্বর সাহেবের কি যেন সমস্যা সমাধান করে দেবেন বলেছিলেন, তা করছেন?

হাবিব ডাক্তার মৃদু হেসে বলল, মাদ্রাসার ভীত দেয়ার সময় দাদাজী সমাধান করে দেবেন। এর বেশি কিছু বলতে পারব না। আপনি কিন্তু ঐদিন সকাল সাতটার মধ্যে চলে আসবেন। একসঙ্গে নাস্তা খেয়ে সবাই রওয়ানা দেব।

ঠিক আছে আসব। এখন তাহলে আসি?

দয়া করে আর একটু বসুন, এতক্ষণ শুধু আলাপই হল। এবার চা-নাস্তা খান, তারপর যাবেন।

পরের দিনই চেয়ারম্যান কয়েকজনকে দিয়ে নিজেদের ও আশপাশের সব গ্রামে ঢেড়া পিটিয়ে দিলেন, "যে মহৎ লোকের উদ্যোগে ও যার মোটা অঙ্কের দানে কুতুবপুর গ্রামে আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তিনি........তারিখে শুক্রবার সকাল দশটায় ভীত দেয়ার জন্য আসবেন। আপনাদের সবাইকে ঐ সময়ের মধ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।"

কথাটা শোনার পর মুশতাক বিশ্বাস একদিন হাবিব ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে বললেন......তারিখে মাদ্রাসার ভীত দেয়া হবে। তুমি তো বলেছিলে তার আগেই উকিলী নোটিশের নিষ্পত্তি করে দেবে? সে ব্যাপারে তো কিছু করলে না?

হাবিব ডাক্তার বলল, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। মাদ্রাসার ভীত দেয়ার দিনই ইনশাআল্লাহ্ নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

মুশতাক বিশ্বাস অবাক কণ্ঠে বললেন, মাদ্রাসার ভীত দেয়ার সঙ্গে উকিলী নোটিশের কি সম্পর্ক, বুঝতে পারছি না।

মাফ করবেন, এখন আপনাকে বোঝাতে পারব না। তবে যা বললাম, তা হবেই।

মুশতাক বিশ্বাস রেগে উঠে বললেন, তুমি কী আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছ? যা বলবে তাই বুঝে নেব?

ছি ছি, এ কী বলছেন? আপনাকে আমি বাবার মতো মনে করি। তাই ছেলে হিসাবে যা করা উচিত, ঐদিন তাই করব। দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। তারপর আপ্যায়ন করিয়ে বিদায় দিল।

দশ

আজ নতুন মাদ্রাসার ভীত দেয়ার দিন। ঢেঁড়া দেয়ার ফলে প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছে। বড় রাস্তা থেকে মাদ্রাসা পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল, সেটা দিয়ে গাড়ি আসবে না। হাবিব ডাক্তারের কথায় চেয়ারম্যান আগেই মাটি ফেলে রাস্তা চওড়া করিয়েছেন। বেলা দশটার সময় একটা বড় মাইক্রোবাস সেই রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় থামল।

গণ্যমান্য লোকেরা অভ্যর্থনা জানানোর জন্য গাড়ির কাছে এগিয়ে এলেন।

গাড়ি থেকে প্রথমে হাবিব ডাক্তারকে নামতে দেখে সবাই অবাক হল। তারপর চেয়ারম্যান নামার পর একে একে হাবিব ডাক্তারের দাদাজী হাসিবুর রহমান, বাবা খলিলুর রহমান ও তিন ভাই নামার পর নাদের আলিকে নামতে দেখে সবাই আর একবার অবাক হল। গাড়িতে তিনজন বোরখাপরা মেয়ে বসে রইল। তাদের মধ্যে একজন আতিকা আর অন্য দু'জন হাবিব ডাক্তারের দাদি ও মা। আতিকা বোরখা পরে রয়েছে। তাই তাকে কেউ চিনতে না পারলেও মুশতাক বিশ্বাস, পারভেজ ও আজরাফ হোসেন অনুমান করতে পারলেন, ওদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই আতিকা।

হাসিবুর রহমানের বয়স সত্তর হলেও সুঠাম দেহের অধিকারী। পাজামা পাঞ্জাবী, মাথায় টুপি ও পাকা চুল দাড়িতে তাকে দরবেশের মতো দেখাচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে সকলের উদ্দেশ্যে সালাম দিলেন।

যারা সামনে ছিলেন, তারা সালামের উত্তর দিয়ে একে একে হাত মোসাফাহা করলেন। চেয়ারম্যান গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে হাসিবুর রহমান ও তাঁর ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর হাসিবুর রহমানকে দেখিয়ে সমস্ত লোকজনদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ইনিই এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ও দশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। আজ ভীত দিতে এসেছেন। তারপর আজরাফ হোসেনকে বললেন, চলুন প্রথমে ভীত দেয়ার কাজটা সেরে ফেলি।

হাসিবুর রহমান তিনটে ইট গাঁথার পর মিস্ত্রীদের কাজ শুরু করতে বলে চেয়ারম্যানকে বললেন, সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়েছেন?

জি, ঐ যে সামনে দেখা যাচ্ছে। আপাতত দু'টো খুঁটি পুঁতে টাঙ্গান হয়েছে। বিল্ডিং হওয়ার পর প্রবেশ পথের গেটের উপর লিখে দেয়া হবে।

হাসিবুর রহমান প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুল (দঃ) এর উপর কয়েকবার দরুদ পাঠ করে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই মাদ্রাসায় প্রথমে দাখিল (দশম) শ্রেণী পর্যন্ত এবং পর্যায়ক্রমে আলিম, ফাজিল ও কামিল চালু করা

হবে। কমিটির সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব, তারা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিল্ডিং-এর কাজ শেষ করে ক্লাস শুরু করার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষক নিয়োগের আগে আমরা আসব। আমরা আখলাকওয়ালা হাক্কানী আলেমদের শিক্ষক নিয়োগ করতে চাই। যাঁরা ছাত্রদেরকেও আখলাকওয়ালা হাক্কানী আলেম গড়ে তুলবেন। এই মাদ্রাসা চালু হওয়ার পর মহিলা মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করা হবে। তারপর হাবিব ডাক্তার চেয়ারম্যানকে এতিমখানা, ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য আবাসিক হোস্টেল ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে যে সব কথা বলেছিল, সেসব বলে বললেন, এইসব করার জন্য ইনশাআল্লাহ টাকা পয়সা আমি তো দেবই, আশা করব, তওফিক অনুযায়ী আপনারাও সাহায্য সহযোগিতা করবেন। আপনারা হয়তো ভাবছেন, আমি ঢাকার লোক হয়ে এই অজপাড়াগাঁয়ে এসব করছি কেন? তা হলে শুনুন, আমার মা মরহুমা জোহরা খানুম এই গ্রামেরই খাঁপাড়ার মেয়ে। আমার নানার নাম মরহুম সহিদুর রহমান খাঁন। আমার আব্বার নাম মরহুম হারুন বিশ্বাস। আর দাদার নাম মরহুম রহিম বিশ্বাস। তারপর মায়ের মৃত্যু ও মৃত্যুর কারণ বলে বললেন, এখানে খাঁপাড়ার যারা মুরুব্বী লোক আছেন, তারা নিশ্চয় ঘটনাটা জানেন। ঘটনা যাই হোক না কেন, ধর্মীয় ও দেশের আইন অনুযায়ী আমি মরহুম হারুন বিশ্বাসের ছেলে এবং মুশতাক বিশ্বাসের বাবার সতেলা ভাই। পুত্র হিসাবে আমি মরহুম হারুন বিশ্বাসের সম্পত্তির অর্ধেক মালিক এবং আমার মা মরহুমা জোহরা খানুম স্ত্রী হিসাবে একের আট অংশের মালিক। এখন আপনারাই বলুন আমি এই সম্পত্তি দাবি করতে পারি কিনা? তারপর তিনি চুপ করে গেলেন।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যিনি দশ লাখ টাকা দিয়েছেন, সেই দানবীর মহান ব্যক্তিকে দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ এসেছে। তারা হাসিবুর রহমানের কথা শুনে অল্পক্ষণের জন্য হতবাক হয়ে গেলেও একসঙ্গে বলে উঠল, নিশ্চয় আপনি দাবি করতে পারেন, এটা আপনার ন্যায্য দাবি। তারপর হট্টগোল শুরু হয়ে গেল।

হাসিবুর রহমান হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বলে বললেন, আপনারা হৈচৈ করবেন না। আমার আরো কিছু বলার আছে।

তার কথা শুনে মুহূর্তে সবাই নীরব হয়ে গেলে কেউ কিছু বলার আগে হাফেজিয়া মাদ্রাসার সেক্রেটারি আব্দুল জব্বার বললেন, আপনার কথামতো আপনি সম্পত্তির হকদার; কিন্তু আপনিই যে হারুন বিশ্বাসের প্রথম স্ত্রীর সন্তান, তার প্রমাণ দিতে হবে।

হাসিবুর রহমান বললেন, একটু আগে বলেছি, আমার মায়ের মৃত্যুর কারণ এই গ্রামের যারা বয়স্ক লোক তারা জানেন। আরো জানেন, আমার খালা

আমাকে মানুষ করার জন্য নিয়ে চলে যান। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। আমি খালা খালুকেই নিজের মা বাবা বলে জানতাম। লেখাপড়া করিয়ে ব্যবসায় নামিয়ে যখন আমার বিয়ে দেবেন ঠিক করলেন তখন একদিন খালার সামনে খালু আমার আসল পরিচয় এবং কেন তারা আমাকে নিয়ে এসে মানুষ করেছেন, সবকিছু বললেন। তারপর একটা ডায়েরী আমার হাতে দিয়ে বললেন, এতে তোমার মা বাবার বংশের পরিচয় ও যা কিছু বললাম সব লেখা আছে। এর ভেতর তোমার শিশুকালের ফটোও আছে। সেই ডায়েরীটা ও আমার মায়ের খুনের মামলার কাগজপত্র কোর্ট থেকে তুলে এনেছি এবং দামুড়হুদা থানায় প্রথমে যে খুনের কেস দেয়া হয়েছিল, সেই কাগজপত্রের নকলও তুলে এনেছি। সেসব চেয়ারম্যান সাহেবকে দেখিয়েছি। আপনারাও দেখতে পারেন।

আব্দুল জব্বার আজরাফ হোসেন ও অন্যান্য কয়েকজন গণ্যমান্য বয়স্ক লোক সেসব কাগজপত্র ও ডায়েরী দেখে বললেন, হ্যাঁ, আপনি যা কিছু বলেছেন সব সত্য।

তারা থেমে যেতে চেয়ারম্যান সবকিছু মুশতাক বিশ্বাসের হাতে দিয়ে বললেন, আপনিও দেখুন।

হাসিবুর রহমানের কথা শুনে মুশতাক বিশ্বাস এত অবাক হয়েছেন যে, চেয়ারম্যানের কথা কানে গেল না। কাগজপত্র হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

পারভেজ আব্বার পাশে ছিল। সে তার হাত থেকে সেগুলো নিয়ে পড়তে লাগল।

মুশতাক বিশ্বাসের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে হাসিবুর রহমান বললেন, "মুসলমান হয়ে আর এক মুসলমানকে সবার সামনে অপদস্থ করা কোনো মুসলমানেরই উচিত নয়।" এটা হাদিসের কথা। মুশতাক বিশ্বাস আমার সতেলা ভাই এর ছেলে। তাকে গ্রামবাসীর কাছে আমিও অপদস্থ করতে চাই নি। একাকী এসব কথা বললে উনি বিশ্বাস করতেন না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও একরকম বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছে। তা ছাড়া আরো একটা কথা, যা সকলের জানা দরকার। বংশ মর্যাদা থাকা ভালো। তাই বলে অন্য বংশকে ছোট মনে করা উচিত নয়। কথায় আছে, "ব্যবহারে বংশের পরিচয়।" উচ্চ বংশের লোকদের যদি ব্যবহার খারাপ হয় অথবা চরিত্রহীন ও ধর্মের প্রতি উদাসীন হয়, আর অখ্যাত বংশের লোকেরা যদি ধার্মিক ও চরিত্রবান হয়, তা হলে ইসলামের দৃষ্টিতে ও সব মানুষের কাছে ঐ অখ্যাত বংশটাই উচ্চবংশ। আমাদের রাসুল (দঃ) বলেছেন, "এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। তাদের একজনের শরীরে আঘাত লাগলে সারা বিশ্বের মুসলমান সেই আঘাত অনুভব করবে।"

তাই কোনো কারণে যদি কারো সঙ্গে ঝগড়া বা মনোমালিন্য হয়, তা হলে তা জিইয়ে না রেখে তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে হবে। হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, "মুসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার রসনা ও হস্ত হইতে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে এবং বিশ্বাসী ঐ ব্যক্তি যাহার হাতে সকল লোকের ধন-প্রাণ নিরাপদ থাকে।"[১]

তাই বলব, শুধুমাত্র অন্য বংশের মেয়ে হওয়ার কারণে রহিম বিশ্বাস পুত্র বধূকে হত্যা করে যে পাপ করেছেন, ছেলে হারুন বিশ্বাস ও পোতা মুশতাক বিশ্বাসের তার প্রতিকার করে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা করেন নি। আর সেই কাজটা করেছে হারুন বিশ্বাসের সতেলা ভাইয়ের চার পোতার ছোট পোতা হাবিবুর রহমান ওরফে আপনাদের হাবিব ডাক্তার। কি করেছে জানেন, এই গ্রামের খাঁ বংশের নাদের আলির সঙ্গে মুশতাক বিশ্বাসের মেয়ে আতিকার বিয়ে দিয়ে দুই বংশের শত্রুতা মিটিয়ে ফেলার রাস্তা করে দিয়েছে এবং এই এলাকার মানুষের মন জয় করে এখানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থাও করেছে। তাকে এসব করার জন্য আমিই পাঠিয়েছিলাম। তার দ্বারা আল্লাহ আমার মনের আশা পূরণ করেছেন। তাই তাঁর পাক দরবারে জানাচ্ছি শত কোটি শুকরিয়া। আর সম্পত্তির দাবি করে মুশতাক বিশ্বাসের কাছে যে উকিলী নোটিশ আমি পাঠিয়েছিলাম, তা মরহুম দাদাজী রহিম বিশ্বাসকে আল্লাহ যেন মাফ করে দেন সেই ব্যবস্থা করার জন্য। আল্লাহ আমাকে ধন ও মান অনেক দিয়েছেন। এখানকার সম্পত্তির উপর আমার এতটুকু লোভ নেই। মুশতাক বিশ্বাস মাদ্রাসায় পাঁচ বিঘে জমি ও পঁচিশ হাজার টাকা দান করেছেন জেনে খুব আনন্দিত হয়েছি। এর জাজা আল্লাহ তাকে দেবেন। এখন উনি যদি সতেলা দাদির নামে এই মাদ্রাসায় আরো দশ বিঘে জমি ও একলক্ষ টাকা দান করার ওয়াদা করেন এবং নাদের আলিকে সম্মানের সঙ্গে জামাই বলে গ্রহণ করেন, তা হলে আমি সম্পত্তির জন্য যে মামলা দায়ের করেছি, তা তুলে নেব। তারপর তিনি চুপ করে গেলেন।

হাসিবুর রহমানের দীর্ঘ কথাবার্তা শুনতে শুনতে মুশতাক বিশ্বাস ও পারভেজের অনেক আগেই ভুল ভেঙ্গে গেছে। তিনি থেমে যেতে পারভেজ আব্বার কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চস্বরে বলল, এখন বুঝতে পারছি সমস্ত দোষ আমাদের পূর্ব-পুরুষদের। আমাদের উচিত হবে ওঁর কথায় রাজি হয়ে পূর্ব-পুরুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা।

অপমানে ও অনুশোচনায় মুশতাক বিশ্বাসের তখন চোখ থেকে পানি পড়ছিল। কিছু বলতে পারলেন না।

---

১ বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)—বুখারী, মুসলিম।

আব্বার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে পারভেজ হাসিবুর রহমানকে কদমবুসি করে বলল, আমিও আপনার পোতাদের একজন এবং আমার আব্বা আপনার ভাইপো। আমি তার হয়ে বলছি, আপনি যা কিছু বললেন, তা আমরা অবশ্যই করব।

হাসিবুর রহমান তাকে বুকে জড়িয়ে মাথায় চুমো খেয়ে দো'য়া করে বললেন, আমার দ্বারা আল্লাহ্ যে তোমাদের ভুল ভাঙ্গিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করার তওফিক দিলেন, সেজন্য তাঁর পাক দরবারে আবার শত কোটি শুকরিয়া জানাচ্ছি।

মুশতাক বিশ্বাস আর স্থির থাকতে পারলেন না। এগিয়ে এসে হাসিবুর রহমানকে কদমবুসি করে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমাকে মাফ করে দিন চাচা। আমি পূর্ব-পুরুষদের পক্ষ থেকেও মাফ চাইছি। এতদিন আমার মন অজ্ঞানতার মেঘে ঢাকা ছিল। আল্লাহ্ আজ আপনার দ্বারা সেই মেঘের কোলে রোদ ফুটিয়ে জ্ঞানের চোখ খুলে দিলেন। সেজন্য আমিও তাঁর পাক দরবারে শত কোটি শুকরিয়া জানাচ্ছি।

হাসিবুর রহমানও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বললেন, সবকিছুই আল্লাহর ইশারা। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

তিনি থেমে যেতে চেয়ারম্যান জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, শুধু বিশ্বাসদের উপর থেকে নয়, এই এলাকার সমস্ত মানুষের মন যে অজ্ঞানতার মেঘে ঢাকা ছিল, আল্লাহ এই মহান ব্যক্তির দ্বারা সেই মেঘের কোলে রোদ ফুটিয়ে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিলেন। সেজন্য আমিও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

জনতার মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠল, "নারায়ে তাকবীর"।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জনতা একসাথে বলে উঠল, "আল্লাহু আকবার"।

এভাবে তিনবার বলার পর চেয়ারম্যান জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, এবার আপনারা চলে যান। মেহমানদের বিশ্রাম দরকার।

জনতা চলে যেতে শুরু করলে হাসিবুর রহমান নাদের আলিকে কাছে ডেকে বললেন, যাও দাদু, তোমার শ্বশুর ও সমন্ধীকে সালাম করে মাফ চেয়ে নাও।

নাদের আলি শ্বশুর ও সমন্ধীকে সালাম করে মাফ চেয়ে অন্যান্য মুরুব্বীদেরকেও সালাম করল।

এবার চেয়ারম্যান হাসিবুর রহমানকে বললেন, গাড়িতে মেয়েরা এতক্ষণ বসে কষ্ট পাচ্ছেন। এখন সবাইকে নিয়ে আমার বাড়িতে চলুন। কিছু খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নেবেন।

হাসিবুর রহমান কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই মুশতাক বিশ্বাস বললেন, তা হয় না চেয়ারম্যান সাহেব, ইনারা বিশ্বাস বাড়ির লোক, বিশ্বাস বাড়িতেই যাবেন। তা ছাড়া মনে হয়, গাড়িতে নিশ্চয় আতিকাও আছে। বিয়ের পর ফিরনীতে মেয়ে জামাই ও তাদের সঙ্গী সাথীরা মেয়ের বাবার বাড়িতেই উঠে। তারপর হাসিবুর রহমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক বলি নি চাচা?